সৎব্যক্তিদের আসরসমূহ থেকে চার আসর

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

শাইখ আহমদ আর-রুমী আল-হানাফী রহ.

অনুবাদ : মোঃ আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1435

IslamHouse.com

المجالس الأربعة من مجالس الأبرار

« باللغة البنغالية »

الشيخ أحمد الرومي الحنفي

ترجمة: محمد أمين الإسلام

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1435

IslamHouse.com

সৎব্যক্তিদের আসরসমূহ থেকে চার আসর

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য চাই, তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি; আর আমাদের নফসের খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ ﴾ [ال عمران: ١٠٢]

“হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থাতেই মারা যেও না।”[১]

---

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ ﴾ [النساء: ١]

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবী কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সম্যক পর্যবেক্ষক।"[২]

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾ [الاحزاب: ٧٠، ٧١]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সঠিক কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে

[২] সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১

ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।”[৩]

অতঃপর

সর্বাধিক সত্য কথা হল আল্লাহর কিতাব; আর সব হিদায়াতের চেয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াতই উৎকৃষ্ট; আর দীনের মাঝে বিদ‘আত তথা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সর্বাপেক্ষা মন্দকাজ; আর প্রত্যেক বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা; আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। **তারপর:**

আহমদ ইবন মুহাম্মদ আর-রুমী আল-হানাফী র. ইমাম বাগবী র. -এর ‘আল-মাসাবীহ’ (المصابيح) গ্রন্থ থেকে একশত হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন; তিনি তার গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন: ‘মাজালিসুল আবরার ওয়া মাসালিকুল আখইয়ার’ (مجالس الأبرار و مسالك الأخيار) [ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের আসর ও ভাল মানুষগণের কর্মপদ্ধতি]। আর এই গ্রন্থটি শাইখ সুবহান বখশ আল-হিন্দী’র উর্দু অনুবাদসহ প্রাচীন পাথরী মুদ্রণে মুদ্রিত; তিনি তার অনুবাদের নাম দিয়েছেন ‘খাযীনাতুল আসরার’ (خزينة الأسرار) [গুপ্ত ভাণ্ডার]।

[৩] সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৭০, ৭১

তাছাড়া শাইখ মুহাম্মদ ইবরাহীম আর-রানদীরী আস-সূরাতী আল-হিন্দীও এই গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেছেন এবং তিনি তার অনুবাদের নাম দিয়েছেন 'নাফায়েসুল আযহার' (نفائس الأزهار) [মূল্যবান পুষ্পরাজি]।

আর শাহ আবদুল আযীয দেহলবী ও মুফতি কেফায়াত উল্লাহ প্রমূখের মত হানাফী আলেমগণ এই গ্রন্থটির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন এবং তারা গ্রন্থটির ও তার লেখকের প্রশংসা করেছেন।[৪]

হানাফী আলেমদের পক্ষ থেকে এই গ্রন্থটির প্রশংসা করার কারণে আমি তার থেকে চারটি আসর বা অধিবেশনকে নির্বাচন করেছি; আমি মনে করি তাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অনেক উপকারিতা ও কল্যাণ রয়েছে এবং আমি আরও মনে করি তাতে যা বর্ণিত আছে, তা জেনে নেওয়া তাদের জন্য খুবই প্রয়োজন; বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের দেশসমূহের অনেক অঞ্চলে কবর কেন্দ্রিক কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ার পর এই বিষয়ে জানার প্রয়োজন আরও বেড়ে গেছে।

[গ্রন্থের আরবী সম্পাদনায় যা যা করা হয়েছে]

১. মূল পাণ্ডুলিপির কোনো হদিস আমার জানা না থাকার কারণে আমি পাথুরে মুদ্রণ বা সংস্করণকে আসল কপি হিসেবে গ্রহণ

[৪] দেখুন: মুকাদ্দামাতু নাফায়েসুল আযহার (مقدمة نفائس الأزهار), পৃ. ৩৬

করেছি।

২. লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী যোগ করেছি।

৩. আল-কুরআনের আয়াতকে যথাস্থানের দিকে সম্পৃক্তকরণ।

৪. হাদিসে নববীর (বিশুদ্ধতার) মান বর্ণনাসহ যথাসম্ভব তাখরীজ প্রদান।

৫. বিষয়সমূহের সূচিপত্র তৈরি এবং শেষে হাদিসে নববীর সূচি আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে বিন্যস্তকরণ।

৬. উপ-শিরোনাম প্রবর্তন, যা গ্রন্থের মধ্যকার বিষয়কে ব্যাখ্যা করে।

আর আল্লাহর নিকট তা কবুল করার জন্য প্রার্থনা করি; তিনি হলেন এই কাজের ইচ্ছা ও উদ্যোগ গ্রহণের নেপথ্যশক্তি; আর তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম অভিভাবক।

লেখেছেন:

মুহাম্মদ ইবন আবদির রহমান আল-খুমাইস

লেখক পরিচিতি

তিনি আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-আকহাসারী আল-হানাফী, তিরি আর-রুমী বলে পরিচিত; আর তিনি হলেন উসমানী খিলাফতের আলেমদের মধ্যে অন্যতম একজন; তাঁর রচিত কতগুলো গ্রন্থ রয়েছে। তিনি তার জীবন শরী'য়তের জ্ঞান শিক্ষাদানে, ফতোয়াদানে ও গ্রন্থ রচনায় ব্যয় করেছেন।

আর তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের অন্যতম হচ্ছে:

১. হাশিয়াতুন 'আলা তাফসীরে আবি সা'উদ (حاشية على تفسير أبي السعود)।

২. দাকায়েকুল হাকায়েক (دقائق الحقائق)।

৩. শরহু আদ-দুররিল ইয়াতীম ফিত তাজবীদ (شرح الدر اليتيم في التجويد)।

৪. মাজালিসুল আবরার ওয়া মাসালিকুল আখইয়ার ফী শরহে মিয়াতে হাদিস মিন আল-মাসাবীহ (مجالس الأبرار و مسالك الأخيار في شرح مائة حديث المصابيح)।

তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ১০৪৩ হিজরিতে মারা যান।[৫]

[৫] দেখুন: তার জীবনী: হাদিয়াতুল ‘আরেফীন (هدية العارفين) ১/১৫৭; কাহালা, মু‘জামুল মুআল্লিফীন (معجم المؤلفين), ২/৮৩

প্রথম আসর

মূলগ্রন্থে তা সতেরতম আসর

কবরের নিকট সালাত পড়া, কবরবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা এবং তার উপর প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালানোর অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে

কবর পূজারীদের জন্য অভিশাপ এবং কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (أخرجه البخاري ومسلم).

"ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ), তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।"[৬] এই

---

[৬] বুখারী (৭/৭৪৭), হাদিস নং- ৪৪৪৩, অধ্যায়: মাগাযী (كتاب المغازي), পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতা ও তাঁর মৃত্যু (باب مرض النبي صلى الله عليه و سلم ووفاته); মুসলিম (১/৩৭৭), হাদিস নং- ৫৩১, অধ্যায়: মাসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ (المساجد و مواضع الصلاة) পরিচ্ছেদ: কবরের

হাদিসটি ‘মাসাবীহ’ (المصابيح) গ্রন্থের বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বর্ণনা করেছেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর লা‘নত করার কারণ হল, তারা ঐসব স্থানে সালাত আদায় করত, যেখানে তাদের নবীদেরকে দাফন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে হয়তো তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এমন যে, তাদের নবীদের কবরসমূহের উদ্দেশ্যে সিজদা করার অর্থ হচ্ছে তাদের নবীদের সম্মান করা; বস্তুত এটা হচ্ছে প্রকাশ্য শির্ক, এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعبد » (أخرجه مالك وأحمد).

“হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানিও না, যার পূজা করা হবে।”[৭]

উপর মাসজিদ নির্মাণ, মাসজিদে ছবি বানানো ও কবরকে সিজদার স্থান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে (باب النَّهْىِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّوَرِ فِيهَا) (وَالنَّهْىِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ) । তাঁরা উভয়ে আয়েশা রা. থেকে উবায়দুল্লাহ ইবন আবদিল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবন ‘আব্বাস রা. বর্ণিত হাদিস থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণনা করেছেন।

[৭] আহমদ (২/২৪৬) মারফু‘ সনদে সুহাইল ইবন আবি সালেহ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা থেকে, তার পিতা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে মুসনাদে আহমদে "يعبد" কথাটি নেই; মালেক

অথবা তাদের ধারণা ছিল যে, তাদের নবীদের কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায়ের দ্বারা তারা আল্লাহ তা'আলা'র নিকট মহান মর্যাদা লাভ করবে; কেননা তা দু'টি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: একদিকে আল্লাহ তা'আলা'র ইবাদত করা এবং অপরদিকে তাদের নবীদেরকে সম্মান করা। বস্তুত তাদের এ জাতীয় ধারণাও গোপন শির্ক (شرك خفي)। আর এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য সমাধিস্থলে সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন, যদিও উদ্দেশ্য দু'টি ভিন্ন।

তিনি আরও বলেছেন:

« ... أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ » . (أخرجه مسلم) .

" ... সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও পুণ্যবান লোকদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে। সাবধান! তোমরা

(১/১৭২), হাদিস নং- ৮৫, অধ্যায়: কসরের সালাত প্রসঙ্গে (في قصر الصلاة), পরিচ্ছেদ: জামে'উস সালাত (باب جامع الصلاة), তিনি 'আতা ইবন ইয়াসার থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, আর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন; আবদুর রাযযাক (৮/৪৬৪), হাদিস নং- ১৫৯১৬, তিনি সাফওয়ান ইবন সুলাইম এবং সা'ঈদ ইবন আবি সা'ঈদ মাওলা আল-মাহরী'র সনদে মারফু' এবং মুরসাল সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

কবরকে মসজিদ বানিও না। আমি তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি।”[৮] কোন কোন বিশ্লেষক বলেন: পুণ্যবান ব্যক্তিগণের সমাধিস্থলের মত স্থানসমূহে সালাত আদায় করা এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; বিশেষ করে যখন এই ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে কবরবাসীকে সম্মান করা; কেননা, এর মধ্যে শির্কে খফী (شرك خفي) রয়েছে; কারণ, মূর্তি পূজার সূচনা হয়েছিল নবী নূহ আ. -এর জাতির মধ্যে, সমাধিস্থলে তাদের অবস্থান করার কারণে; যেমন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন:

﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا ۝٢١ وَمَكَرُواْ مَكۡرًا كُبَّارًا ۝٢٢ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرًا ۝٢٣ ﴾ [نوح: ٢١، ٢٣]

[৮] মুসলিম (১/৩৭৭), হাদিস নং- ৫৩১, অধ্যায়: মাসজিদ ও সালাতের স্থানসমূহ (المساجد و مواضع الصلاة), পরিচ্ছেদ: কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ, মাসজিদে ছবি বানানো ও কবরকে সিজদার স্থান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে (باب النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتِّخَاذِ الصُّوَرِ فِيهَا وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ), তিনি আবদুল্লাহ ইবনিল হারেস আন-নাজরানী থেকে পরিপূর্ণভাবে মারফু‘ সনদে হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন, তিনি জুনদুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন। আর ইবনু সা‘য়াদ বর্ণনা করেছেন ‘আত-তাবাকাত’ –এর মধ্যে, তার প্রথম কথা হল: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»।

“নূহ্ বলেছিলেন, ‘হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি; আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে এবং বলেছে, ‘তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্, সুওয়া‘আ, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ও নাসরকে।”[৯]

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. ও অন্যান্য পূর্ববর্তী আলেমগণ বলেন: আয়াতে উল্লেখিত ঐসব ব্যক্তিবর্গ ছিলেন নবী নূহ আ. -এর জাতির মধ্যকার সৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত; যখন তাঁরা মারা গেলেন, তখন জনগণ তাঁদের সমাধিস্থলে অবস্থান করতে লাগল, অতঃপর তারা তাঁদের প্রতিমূর্তি বানাল, অতঃপর তাদের এই অবস্থার উপর দিয়ে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তারা তাঁদের উপাসনা করা শুরু করল।[১০] এটাই হল মূর্তিপূজার গোড়ার কথা; আর ইবনুল কায়্যিম র. তাঁর ইগাসাতুল লাহফান গ্রন্থে এর সমর্থনের তার শাইখের পক্ষ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: নিশ্চয় এটিই হচ্ছে মূল ইল্লত বা কারণ, যার ফলে শরী‘য়ত প্রবর্তক কবরকে মসজিদ বা সালাত আদায়ের স্থান হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ঠিক সেই কারণটিই

---

[৯] সূরা নূহ, আয়াত: ২১ - ২৩

[১০] বুখারী (৮/৫৩৫), হাদিস নং- ৪৯২০, তাফসীর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: (ওয়াদ্, সুওয়া‘আ, ইয়াগূছ ও ইয়া‘ঊক) প্রসঙ্গে (" بَاب " وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ "), হাদিসটি ‘আতা র. সূত্রে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত।

অনেক মানুষের জীবনে বাস্তবে ঘটছে; হয় সে শির্কে আকবার বা বড় শির্কের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে, অথবা এর কাছাকাছি পর্যায়ের শির্কে জড়িয়ে পড়ছে; কারণ, যিনি সৎ ও আস্থাবান, এমন ব্যক্তির কবরের মাধ্যমে শির্ক করাটা গাছ অথবা পাথরের মাধ্যমে শির্ক করার চেয়ে মনের দিক থেকে অধিক কাছাকাছি। আর এ জন্যই আপনি অনেক মানুষকে কবরের নিকট অনুনয় ও বিনয় প্রকাশ করতে দেখতে পাবেন; সেখানে তারা বিনীতভাবে আন্তরিকতা সহকারে এমনভাবে ইবাদত করে, যেমন ইবাদতের কাজটি তারা আল্লাহ তা‘আলার ঘরসমূহের মধ্যেও করে না এবং রাতের শেষ প্রহরেও না। আর তারা সেখানে সালাত আদায়ের দ্বারা এমন বরকত প্রত্যাশা ও প্রার্থনা করে, যে প্রত্যাশা তারা মসজিদসমূহের মধ্যে করে না। সুতরাং এই ধ্বংসাত্মক বিষয়টির মূলোৎপাটন করার জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে সমাধিস্থলে সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন[১১]; যদিও মুসল্লী সেখানে সালাত

---

[১১] যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام» (কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীই মাসজিদের মত সালাত আদায়ের স্থান)। - আহমদ (৩/৮৩, ৯৬); আবূ দাউদ (১/৩৩০), হাদিস নং- ৪৯২, সালাত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: যেসব স্থানে সালাত আদায় অবৈধ (باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة); তিরমিযী (২/১৩১), সালাত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত গোটা পৃথিবীই মাসজিদ হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণনা (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد الا المقبرة والحمام) এবং তিনি বলেছেন: এই হাদিসটির মধ্যে গোলমাল রয়েছে; ইবনু মাজাহ (১/২৪৬), হাদিস নং- ৭৪৫,

আদায় করা দ্বারা সে স্থান থেকে বরকত গ্রহণ করার উদ্দেশ্য না থাকে; যেমনিভাবে তিনি সূর্য উদয়ের সময়, অস্ত যাওয়ার সময় এবং স্থির মধ্য আকাশে অবস্থানের সময় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন; কারণ, এ সময়গুলোতে মুশরিকগণ সূর্যের পূজা করে, তাই তিনি তাঁর উম্মতকে এ সময়গুলোতে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, যদিও (সে সময়গুলোতে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে) তাদের উদ্দেশ্য মুশরিকদের উদ্দেশ্যের মত নয়।

আর যখন কবরস্থানে সালাত আদায়ের দ্বারা ব্যক্তির উদ্দেশ্য হয় ঐ ভূমির বরকত হাসিল করা, তখন এটা হবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সাথে প্রকৃত শত্রুতা করা, তাঁর দীনের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং এমন দীন তথা নতুন বিধিবিধান প্রবর্তন করা, যার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দেননি।

অধ্যায়: মাসজিদ ও জামায়াত (كتاب المساجد و الجماعات), পরিচ্ছেদ: যেসব স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ (باب المواضع التي تكره فيها الصلاة); ইবনু হাব্বান (৩/১০৩) হাদিস নং- ১৬৯৭, (৪/৩২) হাদিস নং- ২৩১২, (৪/৩৩) হাদিস নং- ২৩১৬ (ইহসান); হাকেম (১/২৫১) এবং তিনি এই সনদগুলো বর্ণনা করার পর বলেন: সবগুলো সনদই ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. –এর শর্ত অনুযায়ী সহীহ, তবে তাঁরা হাদিসটি তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেননি; আর ইমাম যাহাবী র.ও অনুরূপ কথাই বলেছেন; তারা সকলেই মারফু' সনদে 'আমর ইবন ইয়াহইয়া আল-আনসারী'র সূত্রে তার পিতা থেকে, তিনি আবূ সা'ঈদ রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

ইবাদতের মূলভিত্তি হল অনুসরণ করা, নতুন মত প্রবর্তন করা নয়

ইবাদতের মূলভিত্তি হল অনুকরণ ও অনুসরণ করা, খেয়াল-খুশি ও বিদ'আতের অনুসরণ করা নয়। মুসলিমগণ তাদের নবীর দীন থেকে যে শিক্ষা লাভ করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ মত পেশ করেছেন যে, সমাধিস্থলে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। কারণ, সূর্য উদয়-অস্ত যাওয়ার সময় এবং স্থির মধ্য আকাশে অবস্থানের সময় সালাত আদায় করার দ্বারা যে অনিষ্ট সংঘটিত হয়, কবরের নিকটে সালাত আদায় করা তার চাইতে আরও বেশি বিপজ্জনক হিসেবে বিবেচিত, যেহেতু তা শির্ক ও মূর্তিপূজার সাথে অধিক সাদৃশ্য রাখে। যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যের পথ বন্ধ করার জন্যই উক্ত তিন সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (যে সাদৃশ্যতা সাধারণত মুসল্লীর মনেও উদিত হয় না); সেখানে কবরস্থানে সালাত আদায় কীভাবে বৈধ হতে পারে? অথচ কবরস্থানে সালাত আদায়কারী ব্যক্তি সাধারণত এমন অনেক অপকর্ম ও অপবিশ্বাস লালন করে, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। যেমন: ওলীদেরকে ডাকা, তাদের নিকট প্রয়োজনীয় বস্তু চাওয়া, তাদের কবরের নিকট সালাত আদায় করা এ বিশ্বাসে যে মসজিদে সালাত আদায় করার চেয়ে সেখানে আদায় করা অনেক উত্তম ও ফযিলতপূর্ণ ইত্যাদি।

ইবনুল কায়্যিম র. তাঁর ইগাসাতুল লাহফান গ্রন্থে বলেন: "যে ব্যক্তি কবরের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ

ও আদেশ-নিষেধ এবং সাহাবী ও তাবে'য়ীগণের নীতিমালাকে আজকের দিনের অধিকাংশ মানুষের নীতিমালার সাথে তুলনা করবে, সে ব্যক্তি দেখতে পাবে যে তার একটি অপরটির বিপরীত, ফলে কখনও উভয়টির সহ-অবস্থান সম্ভব হবে না। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের নিকট সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা তাঁর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে সেখানে সালাত আদায় করে; আর তিনি কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর মসজিদ নির্মাণ করে ও সেখানে সৌধ নির্মাণ করে; আর তিনি তার উপর বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা তাঁর এই কথার বিরোধিতা করে তার উপর প্রদীপ ও মোমবাতি প্রজ্বলিত করে, বরং তারা এটা করার জন্য বিবিধ ধরনের ওয়াকফও করে থাকে।

আর তিনি কবর বাঁধাই করতে ও তার উপর ঘর বানাতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা তাঁর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে কবরকে বাঁধাই করে ও তার উপর গম্বুজ প্রতিষ্ঠা করে; আর তিনি কবরের উপর লিখতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা তাঁর নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে তার উপর ফলক স্থাপন করে ও তার উপর আল-কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ করে; আবার তিনি কবরের উপর তার মাটি ব্যতীত বাড়তি কোনো কিছু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা তাঁর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে কবরের উপর মাটি ব্যতীত ইট, পাথর ও চুনকামের মাধ্যমে স্থাপনা

তৈরি করতে চায়। তিনি কবরকে উৎসবস্থল হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, অথচ তারা তাঁর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে উৎসবস্থল হিসেবে গ্রহণ করে, তাকে উদ্দেশ্য করে তারা সমাবেশ ঘটায়, যেমনিভাবে তারা ঈদ-উৎসবকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়, অথবা তার চেয়ে বেশি। মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিষয়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, তারা তার বিরোধিতা করে এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন, তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

কবর পূজারীদের বিভ্রান্তির প্রসারতা

ঐসব পথভ্রষ্টদের দ্বারা বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, তারা কবরকে হাজ্জের স্থানে (তীর্থস্থানে) পরিণত করল এবং তার জন্য নিয়মনীতি তৈরি করল, এমনকি তাদের মধ্যকার সীমালঙ্ঘনকারীদের কেউ কেউ কবরকে মক্কার সম্মানিত ঘর ‘বাইতুল্লাহর’ সাথে তুলনা করে এ ব্যাপারে গ্রন্থ রচনা করেছে এবং তার নাম দিয়েছে ‘মানাসিকু হাজ্জিল মাশাহেদ’ (مناسك حج المشاهد) [পবিত্র স্থানসমূহে হাজ্জের নিয়মনীতি]। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, এটা হলো দীন ইসলাম পরিত্যাগ এবং মূর্তিপূজারীগণের ধর্মে প্রবেশ করা! সুতরাং আপনি তুলনামূলকভাবে লক্ষ্য করুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত যে শর‘য়ী বিধান দিয়েছেন তার প্রতি, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং সেসবের প্রতিও লক্ষ্য করুন, ঐসব ব্যক্তিগণ যেসব নিয়ম প্রণয়ন

করেছে আপনি অবশ্যই এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এ কবরগুলোকে নিয়ে বাড়াবাড়ির মাধ্যমে এমন সব ফেতনা-ফাসাদের উৎপত্তি হয় যা বর্ণনা করে শেষ করতে মানুষ অপারগ; যেমন:

- কবরের স্থানটিকে সম্মানিত মনে করা, যার ফলে সে তার সাথে ফিতনায় জড়িত হয়ে পড়ে।
- কবরকে মসজিদসমূহের উপর মর্যাদা দেওয়া, অথচ মসজিদ হচ্ছে পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ভূমি। তারা যখন কবরের প্রতি মনোনিবেশ করে, তখন তারা এমন শ্রদ্ধা, সম্মান, বিনয়, নম্রতা, হৃদয়ের কোমলতা ইত্যাদি সহকারে তার প্রতি মনোনিবেশ করে, মসজিদসমূহের ইচ্ছা করলে সেরূপ কিছু বা তার কাছাকাছিও তাদের মধ্যে অর্জিত হয় না।
- কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করা এবং তার উপর প্রদীপ জ্বালানো।
- কবরে অবস্থান করা, তার উপর পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া এবং তার জন্য সেবক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী নিয়োজিত করা, এমনকি তার উপাসকগণ তার নিকটে অবস্থান করাটাকে মসজিদে হারামের নিকট অবস্থান করার উপর প্রধান্য দিয়ে থাকে এবং তারা তার খাদেমদেরকে মসজিদের খাদেমদের চেয়ে মর্যাদাবান মনে করে!

- কবরের উদ্দেশ্যে ও তার খাদেমদের জন্য মানত করা!
- কবরের নিকট সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তা যিয়ারত করা; আর তাকে প্রদক্ষিণ করা, চুম্বন করা, স্পর্শ করা, গালের মধ্যে তার মাটি লাগানো, তার বালি গ্রহণ করা, কবরবাসীকে ডাকা, তাদের মাধ্যমে উদ্ধার কামনা করা, তাদের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা, রিযিক, ক্ষমা, সন্তান, ঋণ পরিশোধ, দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা, চিন্তামুক্ত করা ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োজন পূরণের জন্য সাহায্য চাওয়া, যা মূর্তিপূজারীগণ তাদের মূর্তিদের নিকট চেয়ে থাকে। অথচ এর কিছুই মুসলিম আলেমদের সর্বসম্মত মতে শরী‘আতসম্মত নয়; কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা, তাবে‘য়ীন ও দীনের সকল ইমামগণের মধ্য থেকে কেউ তা থেকে কোনো কিছু করেননি।

  আর এটাও অসম্ভব যে, এগুলো থেকে কোনো কিছু শরী‘য়তসম্মত ও ভাল কাজ বলে গণ্য হওয়া সত্বেও পূর্ববর্তী সোনালী তিন যুগের ঐসব ব্যক্তিবর্গ তার থেকে বিরত থাকবেন যাঁদের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, অথচ সেটা পেয়ে ধন্য হবে সেসব পশ্চাতে আগমনকারী ব্যক্তিবর্গ যাদের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাদের মধ্যে মিথ্যা ও পাপাচার বেড়ে যাবে।

সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে থাকলে সে যেন লক্ষ্য করে, যমীনের উপরে বসবাসকারী কারও পক্ষে পূর্বোক্ত

সাহাবা, তাবেঈন ও ইমামদের কোনো একজন থেকেও কি একটি সহীহ অথবা দুর্বল বর্ণনা নিয়ে আসতে পারবে যাতে দেখা যায় যে, যখন তাদের কোনো প্রয়োজন দেখা দিত তখন তারা কবরের প্রতি মনোনিবেশ করে কবরবাসীর নিকট প্রার্থনা করেছেন? তা মাসেহ করেছেন? সেখানে সালাত আদায় করা কিংবা সেগুলোর নিকট তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য আবেদন করার মত কিছু তো অনেক দূরের ব্যাপার। কখনও নয়, এ জাতীয় কোনো কিছু তারা কখনও আনয়ন করতে সক্ষম হবে না। অবশ্য তারা পরবর্তী লোকদের থেকে এ ধরনের বহু কাজের দৃষ্টান্ত নিয়ে আসতে পারবে। অতঃপর কাল যত প্রলম্বিত হচ্ছে এবং সময় যত দীর্ঘায়িত হচ্ছে, এ জাতীয় গর্হিত কর্মকাণ্ড পরবর্তী লোকদের থেকে ততই বেশি পরিমানে যোগ হচ্ছে। এমনকি (পরবর্তীদের দাবী অনুযায়ী কবরের সাথে বাড়াবাড়ির) এ বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ আমি পেয়েছে যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবী ও তাবে‘য়ীগণের নিকট থেকে একটি বর্ণও বর্ণিত নেই।

বরং এ বিষয়ে তাদের দাবীর বিপরীতে অনেক মারফু‘ হাদিসের বর্ণনা রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا» . (أخرجه أحمد والنسائي بتمامه).

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, সুতরাং যে ব্যক্তি (বর্তমানে) কবর যিয়ারত করতে চায়, সে যেন যিয়ারত করে এবং তোমরা খারাপ (বাজে) কথা বলবে না।”[১২] আর কবরের নিকট শির্কের চেয়ে বড় ধরনের বাজে কথা ও কাজ কোনটি!

আর সাহাবীদের নিকট থেকে আগত বর্ণনার সংখ্যা অনেক, যা গণনায় সীমাবদ্ধ করাটা দূরূহ ব্যাপার, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে: ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে কোনো এক কবরের নিকট সালাত আদায় করতে দেখে বললেন, কবর!

---

[১২] আহমদ (৩/৩৮) মারফূ‘ সনদে মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া ইবন হাব্বান থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেন, তিনি তার চাচা থেকে, তার চাচা আবূ সা‘য়ীদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তার শব্দগুলো হল: « إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً» (আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, সুতরাং তোমরা তা যিয়ারত কর; কারণ, তাতে শিক্ষা বা উপদেশ রয়েছে)। হাইসামী র. ‘আল-মাজমা‘’ [المجمع] (৩/৫৭) গ্রন্থের মধ্যে বলেন: ইমাম আহমদ র. হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণনাকারী ব্যক্তিগণ সকলেই বিশুদ্ধ হাদিসের বর্ণনাকারী। আর ইমাম নাসায়ী র. (৪/৮৯) জানাযা অধ্যায়ের ‘কবর যিয়ারতের পরিচ্ছেদে (باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ) মারফূ‘ সনদে (ইবনু বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে) হাদিসখানা সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন।

কবর[১৩]! ইবনুল কায়্যিম র. তার 'আল-ইগাসা' গ্রন্থে বলেন: "এটা প্রমাণ করে যে, সাহাবীদের নিকট এটা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, কবরের কাছে সালাত আদায় করা যায় না। কারণ তাদের নবী তাদেরকে কবরের নিকট সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন; আর আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু'র কাজ প্রমাণ করে না যে, তিনি কবরের নিকট সালাত আদায় করাকে বৈধ বলে বিশ্বাস করতেন; কারণ, হতে পারে তিনি তা দেখেননি অথবা তিনি জানতেন না যে, তা কবর, অতঃপর যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে সতর্ক করলেন, তখন তিনি সতর্ক হয়ে গেছেন।

□ কবর কেন্দ্রিক ফেতনা-ফাসাদের অন্যতম একটি বড় ফেতনা হচ্ছে, কবরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করা, যেমনিভাবে আহলে কিতাবদের মুশরিকগোষ্ঠী তাদের নবী ও সৎব্যক্তিদের কবরসমূহকে উৎসবের স্থানে পরিণত করেছে! কেননা তারা তাদের কবরসমূহ যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হত এবং তারা সেখানে খেল-তামাশা ও আনন্দ-উল্লাস, গান-বাদ্যে মগ্ন থাকত; তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এর থেকে নিষেধ করেছেন। যেমন আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু

---

[১৩] বুখারী, অধ্যায়: মাসজিদ (أبواب المساجد), পরিচ্ছেদ: জাহেলী যুগের মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলে তদস্থলে মাসজিদ নির্মাণ করা প্রসঙ্গে (باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد), তা'লীক।

‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ » . (أخرجه أبو داود) .

“তোমরা আমার কবরকে উৎসবের জায়গায় পরিণত করো না; আর তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ কর; কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়ে থাকে।”[১৪]

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যমীনের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম কবর হওয়া সত্ত্বেও যখন তাকে উৎসবের জায়গায় পরিণত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তখন অন্যের কবরকে উৎসবের জায়গায় পরিণত করা নিষিদ্ধ হওয়া আরও বেশি যুক্তিযুক্ত। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণী “তোমরা আমার উপর সালাত (দুরূদ) পাঠ কর; কারণ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন,

---

[১৪] আবূ দাউদ (২/৫৩৪), হাদিস নং- ২০৪২, অধ্যায়: হজ্জের কাজসমূহ (كتاب المناسك), পরিচ্ছেদ: কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে (باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ), হাদিসটি সা‘ঈদ ইবন আবি সা‘ঈদ আল-মাকবেরী আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন; আলবানী ‘সহীহ আল-জামে‘ আস-সাগীর’ [صحيح الجامع الصغير] (২/১২১১), হাদিস নং- ৭২২৬

তোমাদের সালাত আমার নিকটে পৌঁছানো হয়” এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে যে কেউ তাঁর নিকট সালাত ও সালাম (দুরূদ) পাঠানোর ইচ্ছা পোষণ করে, তাঁর কবর থেকে তাদের অবস্থান নিকটে ও দূরে হওয়া সত্ত্বেও তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে; সুতরাং তাদের জন্য তার কবরকে উৎসবের জায়গায় পরিণত করার কোনো প্রয়োজন নেই; কেননা কবরকে উৎসবের জায়গায় পরিণত করার মধ্যে এমন অনেক ফেতনা ও সমস্যা রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। কারণ; যারা কবরকে ঈদ বা উৎসবস্থল বানায় তাদের মধ্যে সীমালঙ্গনকারীদের দেখা যায় যে তারা যখন তাকে দূরবর্তী স্থান থেকে দেখে, তখন তারা তাদের বাহন থেকে নেমে পড়ে, তাদের মাথাসমূহ উন্মুক্ত করে, তাদের কপালসমূহ যমীনের উপর রাখে এবং যমীনকে চুম্বন করে, অতঃপর তারা যখন সমাধিস্থলে পৌঁছে, তখন তারা তার নিকটে দুই রাকাত সালাত আদায় করে; অতঃপর তারা সম্মানিত কা'বা ঘর -যাকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জন্য বরকত ও হিদায়াতের কেন্দ্র বানিয়েছেন- তাকে তাওয়াফ করার মত সে কবরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে করে থাকে। অতঃপর তারা তাকে এমনভাবে চুম্বন ও স্পর্শ করতে শুরু করে, যেমনটি হাজীগণ মসজিদে হারামে করে থাকে। অতঃপর তারা তাদের কপালে ও গালে মাটি মেখে নেয়, অতঃপর তারা মাথা মুণ্ডন অথবা মাথার চুল কাটার মাধ্যমে কবরের হজ্জের যাবতীয় কাজের পরিপূর্ণ

সমাপ্তি ঘটায়। অতঃপর তারা সেই কবর নামক মূর্তির জন্য কুরবানী পেশ করে। তাদের সালাতসমূহ, যাবতীয় উপাসনা, কুরবানী, বিসর্জিত অশ্রু, উচ্চ আহ্বান, প্রয়োজন পূরণের আবেদন, দুঃখ-কষ্ট লাঘব ও অভাবীদেরকে অভাবমুক্ত করার জন্য এবং রোগাক্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিষ্কৃতি দানের জন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি কোনোটিই আল্লাহ তা'আলা'র জন্য নিবেদিত হয় না, বরং তা নিবেদিত হয় শয়তানের জন্য। কারণ শয়তান হচ্ছে আদম সন্তানদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু, সে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে চলা থেকে বাধা প্রদান করে।

বস্তুত শয়তানের ষড়যন্ত্রের অন্যতম বড় ফাঁদ হলো, মূর্তিপূজার বেদীসমূহ থেকে মানুষের জন্য কোনো বেদী স্থাপন করা[১৫], যা অপবিত্র-ঘৃণিত, শয়তানী কর্মকাণ্ডের শামিল; আর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তা বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এই বর্জন করার সাথে তাদের সফলতাকে শর্তযুক্ত করেছেন; তিনি বলেন:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ﴾ [المائدة: ٩٠]

[১৫] কবরপূজা করাটা দেব-দেবী ও মূর্তিপূজারীদের কাজ বলে প্রমাণিত; কারণ, যখন কবরের উপাসনা করা হয়, তখন তা প্রতিমা ও মূর্তি হয়ে যায়।

“হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয় করার শর তো কেবল অপবিত্র-ঘৃণিত বস্তু, শয়তানের কাজ। কাজেই তোমরা সেগুলো বর্জন কর- যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”[১৬]

আয়াতে বর্ণিত " الأنصاب " শব্দটি " نُصُب " (প্রথম দুই বর্ণে পেশসহ) শব্দের বহুবচন, অথবা " نَصْب " (প্রথম বর্ণে যবর ও দ্বিতীয় বর্ণে সাকিনসহ) শব্দের বহুবচন, আর তা হল এমন প্রতিটি বস্তু, আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে যার পূজা ও উপাসনা করা হয়, যেমন: গাছপালা অথবা পাথর অথবা কবর অথবা এগুলো ব্যতীত অন্য কিছু। তাই এসব কিছুকে ধ্বংস করে ফেলা এবং তার চিহ্ন মুছে ফেলা ফরয[১৭], যেমনভিাবে ওমর র. নিকট যখন সংবাদ পৌঁছল যে, লোকজন ঐ গাছটিকে (বরকত হিসেবে) গ্রহণ করছে, যার নীচে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে বাই‘আত (শপথ) অনুষ্ঠান করেছেন, তখন তিনি ঐ গাছের নিকট লোক পাঠালেন, অতঃপর

---

[১৬] সূরা আল-মায়িদাহ্, আয়াত: ৯০

[১৭] এর মধ্যে ঐসব কবরগুলো ধ্বংস করা ফরয হওয়ার নির্দেশনা রয়েছে, যেগুলোর উপাসনা বা পূজা করা হয় এবং ঐসব কবরের উপর যা নির্মাণ করা হয়েছে, তাও ধ্বংস করা ফরয।

তা কেটে ফেলা হয়।[18] সুতরাং ওমর রা. যখন সে গাছটির সাথে এ আচরণ করেছিলেন, যার নীচে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাই‘আত গ্রহণ করেছিলেন এবং যার আলোচনা আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনের মধ্যে করেছেন, যেমন তিনি বলেন:

﴿ لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ ... ﴾ [الفتح: ١٨]

“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বাই‘আত গ্রহণ করেছিল, ...।”[19] তাহলে এসব (কবর নামক) মূর্তি বা উপাসনার বেদীসমূহের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে, যেগুলোর ফিতনা বড় আকার ধারণ করে এবং যার কারণে ঈমান বিপর্যস্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়।

আর এর চেয়ে আরও উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে দিরারকে (ক্ষতির উদ্দেশ্যে নির্মিত

---

[18] ঘটনাটি ইবনু সা‘দ তার ‘আত-তাবাকাত’ (الطبقات) -এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, ২/১০০; আর ইমাম মুহাম্মদ ইবন ওয়াদ্দাহ ‘আল-বিদা‘উ’ ওয়ান নাহইয়ু ‘আনহা’ (البدع و النهي عنها) নামক গ্রন্থের মধ্যে তা বর্ণনা করেছেন: ৪২ – ৪৩; ইবনু আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ: ২/৩৭৫; আর হাফেজ ইবনু হাজার ‘আসকালানী র. (৭/৪৪৮) সনদটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

[19] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮

মসজিদ) ধ্বংস করে দিয়েছিলেন[২০]; যা প্রমাণ করে যে, মসজিদে দ্বিরার থেকেও বেশি ও বড় ফিতনা ফাসাদের বস্তু বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী জিনিস ধ্বংস করা আবশ্যক; যেমন কবরের উপর নির্মিত মসজিদসমূহ, কারণ-

কবরের উপর নির্মিত মসজিদসমূহের ব্যাপরে ইসলামের বিধান

কবরের উপর নির্মিত মসজিদসমূহের ব্যাপারে ইসলামের বিধান হল, এই ধরনের সব মসজিদকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে, এমনকি তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে; আর অনুরূপভাবে ঐসব গম্বুজগুলোকেও ধ্বংস করা ফরয, যেগুলো কবরের উপর নির্মিত হয়েছে; কারণ, তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবধ্যতা ও তাঁর বিরোধিতার উপর; আর এমন প্রত্যেক স্থাপত্য যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবধ্যতা ও তাঁর বিরোধিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা ধ্বংস করা মসজিদে দিরার (ক্ষতির উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ) ধ্বংস করার চেয়ে উত্তম কাজ। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর স্থাপত্য নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তার উপর মসজিদ নির্মাণকারীদেরকে লা‘নত (অভিশাপ) করেছেন; সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা থেকে নিষেধ করেছেন এবং যা বাস্তবায়নকারী

---

[২০] দেখুন: সীরাতু ইবনে হিশাম (২/৫২৯, ৫৩০)।

ব্যক্তিকে লা‘নত করেছেন, তা দ্রুত ও তাড়াতাড়ি ধ্বংস করা ফরয। আর এ জন্যই কবরের উপর প্রজ্জ্বলিত প্রতিটি মোমবাতি ও প্রদীপ অপসারণ করা ফরয; কারণ, এ কাজ বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিশাপ দ্বারা অভিশপ্ত; আর যে কাজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা‘নত করেছেন, তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

এ জন্যই আলেমগণ বলেছেন: কবরের উদ্দেশ্যে মোমবাতি, তেল ইত্যাদি কোনো কিছুই মানত করা জায়েয হবে না; কারণ, তা অবাধ্যতাপূর্ণ মানত, এটা পূর্ণ করা বৈধ নয়, বরং তাতে শপথের কাফফারার ন্যায় কাফফারা আবশ্যক হবে। অনুরূপভাবে কবরের জন্য কোনো কিছু ওয়াকফ করাও বৈধ নয়; কারণ, এই ওয়াকফ শুদ্ধ হবে না এবং তা বলবৎ রাখা ও বাস্তবায়ন করা বৈধ হবে না। ইমাম আবূ বকর আত-তারতূশী বলেন: আল্লাহ তা‘আলা আপনাদের উপর রহম করুন! আপনারা লক্ষ্য করুন, যেখানেই আপনারা এমন কোনো গাছ দেখতে পাবেন, যাকে জনগণ বিশেষ উপলক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তার কাছে তারা মুক্তি ও আরোগ্য কামনা করে এবং তাতে পেরেক ও কাপড় লটকায় তা-ই শরীয়ত নিষিদ্ধ লটকানোর স্থানে পরিণত হয়, সুতরাং তা আপনারা কেটে ফেলবেন। আর “লটকানোর স্থান” এর কাহিনী হচ্ছে, আরবের মুশরিকদের একটি লটকিয়ে রাখার গাছ ছিল, তারা তাতে তাদের অস্ত্রসস্ত্র ও রসদপত্র লটকিয়ে রাখত এবং তারা তার চতুষ্পার্শ ঘিরে বসত।

যেমনটি ইমাম তিরমিযী র. তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী রা. থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

« خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل حنين و نحن حديثو عهد بالإسلام، و للمشركين سدرة يعكفون حولها و ينوطون بها أسلحتهم و أمتعتهم، يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال النبي صلى الله عليه و سلم: الله أكبر إنها السنن قلتم و الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى ﴿ ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٨﴾ ﴾ [الاعراف: ١٣٨] إنكم لتركبن سنن من كان قبلكم » .

"আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনাইনের যুদ্ধের পূর্বে বের হলাম; তখন আমরা ছিলাম নওমুসলিম; আর মুশরিকদের একটা বরই গাছ ছিল, তারা তার চতুষ্পার্শ ঘিরে বসত এবং তারা তাদের হাতিয়ার ও রসদপত্র তাতে লটকিয়ে রাখত; তাকে "লটকানোর গাছ" বলা হত; অতঃপর আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্যও "লটকানোর গাছ" নির্ধারিত করে দিন যেমনটি নির্ধারিত রয়েছে তাদের জন্য। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "আল্লাহু আকবার! নিশ্চয় এটা স্বীকৃত নিয়মনীতি; ঐ সত্বার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা তো এমন কথাই বলছ, যেমন বনী ইসরাইল মূসাকে বলেছিলঃ (তাদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে আমাদের জন্যও তেমন উপাস্য নির্ধারিত করে দিন; তিনি বললেন: তোমরা তো এক জাহিল

সম্প্রদায়।)[২১] অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে’।”[২২] দেখা যাচ্ছে যে, গাছটিকে হাতিয়ার লটকিয়ে

---

[২১] সূরা আল-‘আরাফ, আয়াত: ১৩৮

[২২] তিরমিযী (৪/৪৭৫), হাদিস নং- ২১৮০, অধ্যায়: ফিতনা (كتاب الفتن), পরিচ্ছেদ: অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে (باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم); আর ইমাম তিরমিযী বলেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ। আহমদ (৫/২১৮); আবদুর রায্যাক (১১/৩৬৯), হাদিস নং- ২০৭৬৩, পরিচ্ছেদ: তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি প্রসঙ্গে (باب سنن من كان قبلكم); তাবারানী, আল-কাবীর (৩/৩২৯০, ৩২৯১, ৩২৯২, ৩২৯৩, ৩২৯৪); ইবনু হাব্বান, আস-সহীহ (৮/২৪৮), হাদিস নং- ৬৬৬৭, পরিচ্ছেদ: এই উম্মত কর্তৃক তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের রীতিনীতি অনুসরণ সম্পর্কিত হাদিসসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে (باب ذكر الأخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم); আত-তায়ালাসী (১৩৪৬); আবূ ই‘য়ালা বর্ণনা করেন তার মুসনাদে (২/১৫৯), হাদিস নং- ১৪৩৭; হুমাইদী বর্ণনা করেন তার মুসনাদে (২/৩৭৫), হাদিস নং- ৮৪৮; ইবনু জারীর, আত-তাফসীর (৯/৪৫), নাসায়ী, আত-তাফসীর (পৃ. ৭৬); আলকায়ী, শরহু উসূললি ই‘তিকাদ [شرح أصول الاعتقاد] (১ /১২৪), হাদিস নং- ৫০৪, ২০৫; ইবনু আবি ‘আসেম, আস-সুন্নাহ (১/৩৭), হাদিস নং- ৭৬; ইবনু আবি শায়বা, ইবনুল মুনযের, ইবনু আবি হাতেম, আবু শাইখ ও ইবনু মারদুইয়াহ প্রমূখ বর্ণনা করেন, যেমনটি রয়েছে আদ-দুররুল মানছূর (الدر المنثور) গ্রন্থে (৩/১১৪)। তাঁদের সকলেই সিনান ইবন আবি সিনান থেকে সনদ পরস্পরায় আবূ ওয়াকিদ আল-লাইসী থেকে মারফূ‘ সনদে বর্ণনা করেছেন; আর এই হাদিসটি বিশুদ্ধ।

রাখা ও তার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে বসার জন্য গ্রহণ করাকে আল্লাহ তা'আলার সাথে অপর ইলাহ গ্রহণ করা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, অথচ তারা এর উপাসনাও করে না এবং এর নিকট কোনো কিছু প্রার্থনাও করে না। তাহলে মানুষ যেসব গাছপালা, পাথর অথবা কবরকে উদ্দেশ্য করে, সম্মান করে, রোগমুক্তি কামনা করে, আর বলে যে এ গাছ-পাথর বা কবর মানত গ্রহণ করে (যে মানত মূলত একটি ইবাদত ও নৈকট্য), আর এসব বেদি মাসেহ করে এবং তা স্পর্শ করে— সেগুলোর ব্যাপারে কীরূপ ধারণা করা সঙ্গত![23]

যে মাকামে ইবরাহীমকে আল্লাহ তা'আলা মুসাল্লা বা সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ সেটাকে স্পর্শ করতে নিষেধ করতেন, যেমনটি ইমাম আযরাকী আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ ﴾ [البقرة: ١٢٥]

[তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর][২৪] এর তাফসীরে কাতাদা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাকামে ইবরাহীমের নিকট সালাত আদায় করতে, তাদেরকে তা স্পর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি; বরং

---

[23] অর্থাৎ তা অবশ্যই শির্ক হিসেবে গণ্য হবে এবং আল্লাহ ব্যতীত এগুলোর ইবাদাত হিসেবে ধর্তব্য হবে। [সম্পাদক]

[২৪] সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১২৫

আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন যে, তাকে স্পর্শ ও চুম্বন করা যাবে না, তবে হাজরে আসওয়াদের বিষয়টি ভিন্ন।

আর রুকনে ইয়ামানী'র ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হল, তাকে স্পর্শ করা যাবে, কিন্তু চুম্বন করা যাবে না। অথচ এ শয়তান সর্বকালে ও সর্বসময়ে সম্মানিত ব্যক্তির কবরকে বেদী হিসেবে পেশ করে, ফলে মানুষজন তাকে সম্মান করে; অতঃপর সে তাকে এমন প্রতিমা বা মূর্তিতে পরিণত করে, আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যার উপাসনা করা হয়; অতঃপর সে তার বন্ধু-বান্ধবদের নিকট নির্দেশনা প্রেরণ করে যে, যে ব্যক্তি তার উপাসনা থেকে নিষেধ করে, তাকে উৎসবের স্থলে পরিণত করতে বারণ করে এবং তাকে প্রতিমা হিসেবে নির্দিষ্টকরণে বাধা প্রদান করে, সে ব্যক্তি তো এর অসম্মান-অপমান করছে এবং তার অধিকার নষ্ট করছে— ফলে মূর্খ ব্যক্তিরা তাকে হত্যা করা ও শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টাসাধনা করে এবং তারা তাকে কাফির বলে ফতোয়া দেয়। অথচ তার অপরাধ তো শুধু এই যে, সে তাদেরকে তাই আদেশ করে, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল আদেশ করেছেন এবং শুধু তা থেকে নিষেধ করে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন।

[কবরপূজায় জড়িয়ে পড়ার পেছনে মূল কারণসমূহ]

কবর পূজারীরা এ কবর পূজার মত ফেতনায় জড়িয়ে পড়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ কাজ করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

- আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে তাওহীদ তথা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা ও শির্কের সকল উপায়-উপকরণ মুলোৎপাটন করার যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞতা। সুতরাং যাদের মধ্যে এ জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে, তাদেরকে যখন শয়তান এ কবর পূজার মত ফিতনার দিকে আহ্বান করে এবং তাদের নিকট এমন কোনো জ্ঞানগত পুঁজি না থাকে যা দ্বারা তারা শয়তানের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তখন তারা তাদের নিকট বিদ্যমান মূর্খতা ও অজ্ঞতার অনুসারে তার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তাদের সাথে থাকা জ্ঞান পরিমাণ তার থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।
- কতগুলো লিখিত হাদিস, যেগুলো কবরের মত মূর্তিপূজারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করে রচনা করেছে; বস্তুত এ হাদিসগুলো তিনি যে দীন নিয়ে এসেছেন, তার সম্পূর্ণ বিরোধী; তেমন একটি (বানোয়াট) হাদিস: « إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور » .

“যখন তোমরা কোন কাজের ক্ষেত্রে দিশেহারা হয়ে যাবে, তখন তোমরা কবরবাসীদের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করবে।”[২৫] অপর আরেকটি (বানোয়াট) হাদিস:

«إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» .

[২৫] 'আজলূনী, কাশফুল খাফা (كشف الخفاء): ১/৮৫

"যখন কাজকর্ম তোমাদেরকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে, তখন তোমাদের উপর আবশ্যক হল কবরবাসীদের অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করা।"[২৬] অপর আরেকটি (বানোয়াট) হাদিস:

« لو حسن أحدكم ظنَّه بحجر نفعه » .

"যদি পাথরের প্রতি তোমাদের কারও ধারণা ভাল হয়, তবে সেই পাথর তার উপকার করবে।"[২৭] এই হাদিসগুলোর মত আরও বহু (বানোয়াট) হাদিস রয়েছে, যেগুলো দীন ইসলামের বিরোধী ও বিপরীত, যা কবরের মত মূর্তিপূজারীগণ তৈরি করেছে এবং যেগুলো অজ্ঞ ও পথভ্রষ্টদের মাঝে চালু রয়েছে; আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, তিনি লড়াই করবেন ঐ ব্যক্তির সাথে, যে পাথর ও বৃক্ষরাজির প্রতি (এ জাতীয়) সুধারণা পোষণ করে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু

---

[২৬] শাইখুল ইসলাম বলেন: "এই হাদিসটি হাদিস বিশারদগণ ও আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদ এবং নির্ভরযোগ্য হাদিসের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের কিছুই পাওয়া যায় না"। দেখুন: আত-তাওয়াসসুল ওয়াল অসিলা (التوسل والوسيلة), পৃ. ২৯৭ এবং আর-রাদ্দু 'আলাল বিকরী (الرد على البكري), পৃ. ৩০২ - ৩০৩

[২৭] 'তামঈযুত তায়্যিব মিনাল খাবীস' (تمييز الطيب من الخبيث) এর ১৩৩ পৃষ্ঠায় এ হাদিসটি বর্ণনার পর বলা হয়েছে: ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা বলেন: নিশ্চয়ই হাদিসটি মিথ্যা ও বানোয়াট; আর ইবনু হাজার 'আসকালানী র. বলেন: এর কোনো ভিত্তি নেই।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে কবরের দ্বারা ফিতনায় নিপতিত হওয়ার সকল পথ থেকে দূরে রেখেছেন।

□ কবরবাসী প্রসঙ্গে বর্ণিত কাহিনীসমূহ; যেমন- অমুক ব্যক্তি কঠিন বিপদের সময় অমুক ব্যক্তির কবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করেছে, অতঃপর সে তা থেকে মুক্তি পেয়েছে। অমুক ব্যক্তির উপর বিপদ নাযিল হলো, অতঃপর এই কবরবাসীর নিকট আবেদন করল, ফলে তার ক্ষতিকর বিষয়টি দূর হয়ে গেল; অমুক ব্যক্তি কোনো এক প্রয়োজনে তাকে ডেকেছে, অতঃপর তার প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেছে। মূলত এসব কবরের খাদেম ও কবরপূজারীদের নিকট এ ধরণের হাজারও কাহিনী রয়েছে, যার আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে।

বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্যে এরা জীবিত ও মৃতদের উপর সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপকারী। আর প্রাণী মাত্রই যখন তার প্রয়োজন পূরণ ও তার জন্য ক্ষতিকারক বস্তু দূর করার ব্যাপারে আসক্ত ও অনুরক্ত থাকে, বিশেষ করে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যায়, তখন সে যে কোনো উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। যদিও তাতে কোনো ধরনের অপছন্দনীয় বিষয় জড়িয়ে থাকুক। সুতরাং কেউ যখন শুনে যে, অমুকের কবর বিষের পরীক্ষিত প্রতিষেধক ঔষধ, সে তখন ঐ দিকে ধাবিত হয়, অতঃপর সে সেখানে যায় এবং তার নিকট মনের যাতনা, বিনয়-নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করার মাধ্যমে দো‘আ করে, অতঃপর তার মনে বিনয়-নম্রতা ও অক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে

আল্লাহ তা‘আলা তার দো‘আ কবুল করেন। মূলত এটা কবরের কারণে নয়; কারণ সে যদি অনুরূপ দো‘আ ক্লাব-বার, গোসলখানা কিংবা বাজারের মধ্যেও করত, তাহলেও তিনি তা কবুল করতেন। সুতরাং জাহিল তথা অজ্ঞ ব্যক্তি ধারণা করে যে, এই দো‘আ কবুল করার ক্ষেত্রে কবরের প্রভাব রয়েছে; অথচ সে জানে না যে, আল্লাহ তা‘আলা নিরুপায় ব্যক্তির দো‘আ কবুল করে থাকেন, যদিও সে কাফির হয়।

তাছাড়া বিষয়টি এমন নয় যে, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যার দো‘আ আল্লাহ তা‘আলা কবুল করেছেন, তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট বা তিনি তাকে ভালবাসেন কিংবা তার কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্তুষ্ট; কারণ, তিনি পুণ্যবান ব্যক্তি ও পাপী উভয়ের দো‘আই কবুল করে থাকেন; অনুরূপভাবে দো‘আ কবুল করেন মুমিন ও কাফিরের।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দয়া ও করুনায় আমাদের জন্য এমন দো‘আ ও আমলকে সহজ করে দিন, যা তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হবে।

* * *

দ্বিতীয় আসর

মূলগ্রন্থে তা আঠারতম আসর

বিদ‘আতের প্রকারভেদ ও তার বিধান প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ». (أخرجه مسلم) .

“অতঃপর, সর্বাধিক সত্য কথা হল আল্লাহর কিতাব; আর সব জীবনাদর্শের চেয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শই সর্বোৎকৃষ্ট; আর দীনের মাঝে বিদ‘আত তথা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সর্বাপেক্ষা মন্দকাজ; আর প্রত্যেক বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা।”[২৮] এই হাদিসটি ‘মাসাবীহ’ (المصابيح) গ্রন্থের বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেছেন।

---

[২৮] মুসলিম (২/৫৯২), জুম‘আ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সালাত ও খুতবা সহজকরণ প্রসঙ্গে (باب تخفيف الصلاة و الخطبة); আহমদ (৩/৩১০, ৩১১), তিনি হাদিসটি জা‘ফর ইবন মুহাম্মদ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি জাবির রা. থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইরবাদ্ব ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদিসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وان كل بدعة ضلالة» . (أخرجه أحمد و الترمذي) .

“আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের মধ্য থেকে যে বেঁচে থাকবে, অচিরেই সে বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে; সুতরাং তোমাদের উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হল, তোমরা আমার পরে আমার সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে ও দাঁত দ্বারা কামড়ে থাকবে; আর দীনের মাঝে বিদ‘আত তথা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা থেকে বেঁচে থাকবে; কারণ, দীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করাই হল বিদ‘আত; আর প্রত্যেক বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা।”[২৯]

---

[২৯] আহমদ (৩/৩১০), তিরমিযী (৫/৪৪), হাদিস নং- ২৬৭৬, ইলম অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সুন্নাহকে গ্রহণ করা এবং বিদ‘আত থেকে দূরে থাকা প্রসঙ্গে (باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع), তিনি হাদিসটি আবদুর রহমান ইবন ‘আমর আস-সুলামীর ধারায় ‘ইরবাদ ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বর্ণনা করেছেন (৪/১২৭) এবং ইমাম আবূ দাউদ (৫/১৩), হাদিস নং- ৪৬০৭, সুন্নাহ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সুন্নাহ’র অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে (باب في لزوم السنة); হাকেম (১/৯৭) এবং তিনি হাদিসটিকে

[বিদ‘আতের প্রকারভেদ]

এই হাদিস দু’টিতে উল্লেখিত বিদ‘আত দ্বারা উদ্দেশ্য হল ‘মন্দ বিদ‘আত’ (البدعة السيئة), যার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ’র মধ্যে কোন দলিল-প্রমাণ এবং স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন সনদ, বক্তব্য অথবা উদ্ভাবিত কিছু নেই। এর দ্বারা ‘মন্দ বিদ‘আত’ (البدعة السيئة) ছাড়া অন্যান্য নতুন করে চালু হওয়া বিষয় রয়েছে এবং যেগুলোর পক্ষে দলিল-প্রমাণ ও স্পষ্ট বা অস্পষ্ট সনদ রয়েছে সে সব বিষয় উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং তা ভ্রষ্টতা বা বিভ্রান্তিকর নয়, বরং তা কখনও কখনও তা বৈধ, যেমন আটার জন্য চালুনি ব্যবহার করা, সর্বদা উন্নতমানের আটা বা ময়দা ভক্ষণ করা। আবার কখনও কখনও তা মুস্তাহাব, যেমন মসজিদের মিনার বানানো ও বইপত্র রচনা করা। আবার কখনও কখনও তা ওয়াজিব, যেমন নাস্তিক ও বিভ্রান্ত দলসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয়ের যথাযথ জওয়াব দেওয়ার জন্য দলিল-প্রমাণ গ্রন্থনা করা।

বিশুদ্ধ বলেছেন; ইবনু হাব্বান (১/১০৪), হাদিস নং- ৫; আবূ না‘ঈম, আল-হিলইয়া [الحلية] (১০ /১১৫), তারা সকলেই আবদুর রহমান ইবন ‘আমর ও হিজর ইবন হিজর আল-কালা‘য়ী’র ধারায় ‘ইরবাদ ইবন সারিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণনা করেছেন; আর আলবানী ‘সহীহ আল-জামে‘ আস-সাগীর’ (صحيح الجامع الصغير) –এর মধ্যে (১/৪৯৯) হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদিস নং- ২৫৪৯।

কারণ, ‘বিদ‘আত’ শব্দটির দু‘টি অর্থ রয়েছে;

একটি হল: সাধারণ ভাষাগত বা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আর তখন তা সব ধরণের নতুন প্রবর্তিত বিয়ককেই অন্তর্ভুক্ত করে, চাই তা স্বভাবগত হউক, অথবা ইবাদতের ক্ষেত্রে হউক।

আর অপর অর্থটি হল: বিশেষভাবে শরী‘য়তের দৃষ্টিকোণ থেকে, আর তা হল সাহাবীগণের পরবর্তী সময়ে শরী‘য়ত প্রবর্তক (আল্লাহ) এর পক্ষ থেকে কথা, কাজ, স্পষ্ট ঘোষণা কিংবা ইশারা-ইঙ্গিত- ইত্যাদি যে কোনোভাবে কোনো প্রকার অনুমোদন ব্যতীত দীনের মধ্যে কম বা বেশি করা।

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, উপরোক্ত হাদিস দু’টির মধ্যে আলোচিত বিদ‘আত যদিও ব্যাপকভাবে সকল প্রকার নতুন প্রবর্তিত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, কিন্তু তার এই ব্যাপকতা আভিধানিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং তার এ ব্যাপকতা হল বিশেষভাবে শরী‘য়তের পারিভাষিক অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে; সুতরাং তা মৌলিকভাবে মানুষের স্বভাবগত ও অভ্যাসগত বিষয়গুলোকে মোটেই অন্তর্ভুক্ত করবে না; বরং তার ব্যাপকতা আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের ধরন ও প্রকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াবী বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়নি, বরং তাঁকে শুধু দীনের বিষয়গুলো শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে; আর এ কথার প্রমাণ বহন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ » . (أخرجه مسلم) .

"তোমাদের দুনিয়ার বিষয়ে তোমরাই ভাল জান; তাই যখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের দীনের কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেব, তখন তোমরা তা অবশ্যই গ্রহণ করবে।"[৩০]

অতঃপর আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিদ'আত কুফরী, আবার কিছু কিছু কুফরী নয়, কিন্তু তা প্রত্যেকটি কবীরা গুনাহের চেয়েও মারাত্মক ধরনের গুনাহ, এমনকি হত্যা ও যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক; আর এই ধরনের বিদ'আতের উপরে কুফরী ছাড়া অন্য কোনো গুনাহ নেই। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ'আত যদিও কুফরীর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, কিন্তু তা কাজে পরিণত করাটা শরী'য়তের অবাধ্যতা ও ভ্রষ্টতা, বিশেষ করে তা যখন সুন্নাতে

[৩০] মুসলিম (৪/১৮৩৬), হাদিস নং- ২৩৬৩, ফাযায়েল অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: শরী'য়ত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আদেশ করেছেন, তা পালন করা ওয়াজিব, আর পার্থিব বিষয়ে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা পালন করা ওয়াজিব নয় (باب وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْىِ), এই হাদিসটি তিনি হিশাম ইবন 'উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা থেকে, তার পিতা আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন; আবার তিনি অন্য সনদে মারফু' হিসেবে আনাস রা. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তার শব্দগুলো: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» -এর মাঝে সীমাবদ্ধ।

মুয়াক্কাদাকে আঘাত করবে। আর অভ্যাস-প্রথাজনিত বিষয়ের ক্ষেত্রে যেসব বিদ‘আত, তা (শরী‘য়তের) অবাধ্যতা ও ভ্রষ্টতার পর্যায়ে পড়ে না, তবে তা পরিত্যাগ করাটা উত্তম[৩১]!

যখন এটা প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন বুঝা গেল যে, মিনারায় আযান দেওয়া সালাতের সময় জানিয়ে দেওয়ার জন্য সহায়তা করে, বইপত্র রচনা করা শিক্ষাদান ও প্রচার কাজের সহায়ক, নাস্তিক ও বিভ্রান্ত দলসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয়ের যথাযথ জওয়াব দেওয়া, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা ও দীনকে রক্ষা করার জন্য দলিল-প্রমাণসহ গ্রন্থ রচনা করা ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ই অনুমোদিত, বরং তা নির্দেশিত; কারণ, মন্দ বিদ‘আত (البدعة السيئة) ভিন্ন যেসব (আভিধানিক) বিদ‘আত রয়েছে, (ইসলামের) প্রথম প্রজন্মের লোকজনের যদিও তার প্রয়োজন হয়নি, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের লোকজনের জন্য তার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং তারা কোনো প্রকার বিরোধ ছাড়াই ইজমা তথা ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাকে উত্তম বলে বিবেচনা করেছন।

[ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো বিদ‘আতই অনুমোদিত নয়]

---

[৩১] মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিদ‘আতসমূহ যদিও আভিধানিক বা আক্ষরিক অর্থের বিদ‘আত, তবে তার ব্যাপারে হালাল বা হারামের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পূর্বে মানুষের জন্য তার উপকারিতার পরিধি ও আল্লাহ তা‘আলার শরী‘য়তের সাথে তার বিরোধের মাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

তবে ব্যাপক অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, মন্দ ও নিন্দিত বিদ‘আতের অস্তিত্ব তো দূরের কথা, যে সব বিদ‘আতকে আভিধানিকভাবে বিদ‘আত বলা হয় সে জাতীয় বিদ‘আতের অস্তিত্বও নির্ভেজাল শারীরিক ইবাদত যেমন- সাওম, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত এবং এ ধরনের কোনো ইবাদত ও তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং এগুলোর মধ্যে যদি কোনো বিদ‘আত হয় তবে তা মন্দ ও নিন্দিত বিদ‘আতই হয়। কেননা, ইসলামের প্রথম যুগে এ কাজ সংঘটিত না হওয়ার কয়েকটি সম্ভাবনা ধরে নেওয়া যায়;

- তার প্রয়োজন না থাকা
- অথবা তার ব্যাপারে বাধা বিদ্যমান থাকা,
- অথবা তার দিকে মনোযোগ না দেওয়া
- অথবা তার ব্যাপারে অলসতা করা,
- অথবা অপছন্দনীয় ও শরী‘য়ত সম্মত না হওয়া।

তন্মধ্যে নির্ভেজাল শারীরিক ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রথম দু’টি কারণ যথাযথ নয়; কারণ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য হাসিল করার প্রয়োজনীয়তা কখনও শেষ হয়ে যায় না; আর ইসলাম বিজয় ও তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর কোনো নিষেধকারী তা থেকে নিষেধ করতে সাহস করতে পারে না। অনুরূপভাবে তার প্রতি মনোযোগ না দেওয়া অথবা সে ব্যাপারে অলসতা করার কথাটিও যথাযথভাবে সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সকল সাহাবীর ব্যাপারে এই ধরনের ধারণা পোষণ করা বৈধ নয়; সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল যে,

উপরোক্ত সম্ভাবনাসমূহের মধ্যে কেবল সর্বশেষ সম্ভাবনা অর্থাৎ ঐ সময়ে এ ধরনের কাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান এই জন্যই ছিল না যে, তা হল বিদ‘আত, যা অপছন্দনীয় ও শরী‘য়ত নিষিদ্ধ।

[বিদ‘আতের ব্যাপারে সাহাবীগণের অবস্থান]

আর বিদ‘আতের এই অর্থকেই আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রা. বুঝাতে চেয়েছেন, যখন তাঁকে এমন এক দলের ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হলো, যারা মাগরিবের সালাতের পর বসে তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বলতে থাকে: তোমরা এতবার ‘আল্লাহু আকবার’ পড়, তোমরা এতবার ‘সুবহানাল্লাহ’ পড় এবং তোমরা এতবার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়। অতঃপর শ্রোতারা তা করতে থাকে। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: “আমি আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ, ঐ আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, অবশ্যই তোমরা অন্ধকারপূর্ণ বিদ‘আত নিয়ে এসেছ অথবা তোমরা জ্ঞানের দিক থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে ছাড়িয়ে গেছ।” অর্থাৎ তোমরা যা নিয়ে এসেছ, হয় তা অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদ‘আত, নতুবা তোমরা সাহাবীগণের কর্মকাণ্ডের সাথে সেটা যুক্ত করছ যা তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে; তাদের মনোযোগের অভাবে অথবা তাঁদের অলসতার কারণে, ফলে ইবাদতের নিত্য-নতুন পদ্ধতি জানার মাধ্যমে তোমরা সাহাবীগণকে পরাজিত করছ; আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু দ্বিতীয়টি অগ্রহণযোগ্য, যথাযথ নয়, সেহেতু প্রথমটিই সাব্যস্ত হলো, অর্থাৎ

তোমাদের এ কর্মকাণ্ড অন্ধকারপূর্ণ বিদ‘আত হওয়া।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। এর উপর ভিত্তি করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তা বলা যাবে, যে নির্ভেজাল শারীরিক ইবাদতের মধ্যে এমন ধরন বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসবে, যা সাহাবীদের যুগে ছিল না। কারণ, সে যদি বিদ‘আতী কাজকে ইবাদত হিসেবে বর্ণনা করে তাকে ‘উত্তম বিদ‘আত’ (বিদআতে হাসানাহ)[৩২] বলে গ্রহণ করে, তাহলে সে ইবাদতসমূহের মধ্যে অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় বিদ‘আত

---

[৩২] বিদ‘আত শব্দটিকে " حسنة " (উত্তম) শব্দ দ্বারা বিশেষিত করাটা বিদ‘আতের বিশুদ্ধ প্রকারভেদ নয়। কেননা ইসলামে ‘উত্তম বিদ‘আত’ (بدعة حسنة) বলতে কিছু পাওয়া যায় না, যেহেতু সর্বজনবিদিত কথা হল: ‘প্রত্যেক বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা’। তবে এখানে প্রনিধানযোগ্য যে, ওমর রাদিয়াল্লাহ ‘আনহুর কথা: " نعمت البدعة هذه " (এই বিদ‘আতটি কতইনা উত্তম) –এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল তার শব্দগত অর্থ, যা " الجديد " (নতুন) শব্দের সমার্থবোধক শব্দ।

আর ইমাম মালেক র. বলেন: যে ব্যক্তি ধারণা পোষণ করে যে, সেখানে ‘উত্তম বিদ‘আত’ (بدعة حسنة) বলতে কিছু একটা আছে, তাহলে সে বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাতের খিয়ানত করেছেন। অথচ আল্লাহ তা‘আলা বলেন: ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾ [المائدة: ٦٧] (হে রাসূল! আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা প্রচার করুন; যদি না করেন, তবে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না) [সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৬৭]; সুতরাং তুমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করবেন।

বলতে কিছু পাবে না; অথচ ইবাদতের মধ্যে অপছন্দনীয় বিদ‘আতের অস্তিত্ব অবশ্যই রয়েছে, যেমনটি আলেমগণ স্পষ্টভাবে তাদের গ্রন্থসমূহের মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

[বিদ‘আতপূর্ণ ইবাদতসমূহ থেকে কিছুর উদাহরণ]

যেমন- রাগায়েব[৩৩] নামক নফল সালাত প্রবর্তন ও তাতে জামায়াতের ব্যবস্থা করা। খুৎবার আযানের আগে রাসূলের উপর দরুদ ও সাহাবাদের উপর রাদিয়াল্লাহু আনহু পাঠ করা, জুম‘আর খুৎবা দেওয়ার সময় আমীন বলা, বিবিধ সুর দিয়ে খুৎবা দেওয়া। অনুরূপভাবে আযান ও কুরআন তিলাওয়াতে নব উদ্ভাবিত বিবিধ সুর, জানাযার সামনে প্রকাশ্যে যিকির করা; বর-কনের সামনে রাস্তায় বড় করে যিকির করা এবং এগুলো ছাড়া আরও অন্যান্য অপছন্দনীয় ও নিন্দনীয় বিদ‘আত যা ইবাদতের মধ্যে মানুষ করে থাকে।

[ইবাদতের মধ্যে কেনো কোনো উত্তম বিদ‘আত নেই?]

---

[33] ‘রাগায়েব’ নামক সালাতটি বিদ‘আত। এটি শা‘বান মাসের ১৫ তারিখ রাত্রে পড়া হয়। ৪৪৮ হিজরী সনে এটা প্রথম চালু হয়। দেখুন, আত-তারতূসী লিখিত আল-হাওয়াদিস ওয়াল বিদা‘ পৃ. ১৩২; আরও দেখুন, আবু শামাহ কর্তৃক লিখা গ্রন্থ আল-বা‘য়িস আলা ইনকারিল বিদা‘য়ী ওয়াল হাওয়াদেস, পৃ. ৩৫। [সম্পাদক]

কেউ হয়ত বলতে পারে যে, “এগুলো অপছন্দনীয় মন্দ বিদ‘আত বা বিদ‘আতে সাইয়্যেয়ার শ্রেণীভুক্ত নয়, বরং তা শরী‘য়তসম্মত ‘উত্তম বিদ‘আত’ বা বিদ‘আতে হাসানার শ্রেণীভুক্ত; সে তার কথার সপক্ষে যুক্তি হিসেবে বলে থাকে যে, সাহাবীদের পরে নবপ্রবর্তিত কিছু কিছু বিষয় উত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে; যেমন: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অতিথিশালা, সরাইখানা, পান্থশালা ইত্যাদি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, যা সাহাবীদের যুগে তৈরি করা হয়নি। সুতরাং তা বিদ‘আতে হাসানাহ হিসেবে বিবেচিত হবে”

এর উত্তর তাকে বলা হবে যে, এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই; কারণ শরী‘য়তের বিশুদ্ধ দলিল দ্বারা যা উত্তম বলে প্রমাণিত হবে, তাতে দু’টি সম্ভাবনা হতে পারে।

এক. এগুলোকে বিদ‘আত হিসেবে ধরা হবে না, ফলে উপরোক্ত দু’টি হাদীসে বর্ণিত (‘প্রত্যেক বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা’) এই عام তথা সাধারণ বা ব্যাপক নির্দেশনা তার মূল অবস্থাতেই থাকবে, তাতে কোনে হের-ফের হবে না।

দুই. সেগুলোকে হাদীসে বর্ণিত (‘প্রত্যেক বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা’) এই عام তথা সাধারণ বা ব্যাপক নির্দেশনা থেকে খাস বা নির্দিষ্ট করে ব্যতিক্রম হুকুম দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। (এখন দেখা যাক এ দু’টি সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।) যে ব্যক্তি নতুন প্রবর্তিত ইবাদতকে উত্তম বলে সাব্যস্ত করার

জন্য এ দাবী করবে যে, হাদীসে বর্ণিত ('প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা') এই عام তথা সাধারণ বা ব্যাপক নির্দেশনা থেকে এগুলো খাস বা নির্দিষ্ট করে আলাদা বিধান দিয়ে বিশেষায়িত করা হয়েছে, তাকে বলা হবে যে, এ (تخصيص) বা বিশেষায়িত করার জন্য এমন দলীল প্রয়োজন যা বিশেষায়িত করার উপযুক্ত হবে। শুধুমাত্র দেশের অধিকাংশ মানুষের আচার-আচরণ কিংবা অনেক পীর-ফকীর বা সাধারণ ইবাদতকারীদের কথাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর ব্যাপক নির্দেশের বিপক্ষে বিশেষায়িতকারী হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। বিশেষায়িত করার দলিল তো কেবল কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতেহাদের ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের ইজমা। পীর-ফকীর ও ইবাদতকারীদের মধ্য থেকে যারা ইজতিহাদ করার যোগ্য নয়, তারা তো সাধারণ জনগণের কাতারে, তাদের কথা বিবেচনাযোগ্য হবে না, যদি না তা ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এটি এমন একটি নিয়ম, যার পক্ষে উম্মতের ইজমা বা ঐক্যবদ্ধ রায় নির্দেশনা প্রদান করে, তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার কিতাবের মধ্যেও এমন বক্তব্য রয়েছে, যা এই নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করছে; যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ﴾ [الشورى: ٢١]

“নাকি তাদের এমন কতগুলো শরীক রয়েছে, যারা এদের জন্য দ্বীন থেকে শরী‘আত প্রবর্তন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?”[৩৪] সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা শরী‘য়ত হিসেবে প্রবর্তন করেননি এমন কোনো কথা বা কাজ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নতুনভাবে প্রবর্তন করে, সে তো দীনের মধ্যে এমন বিধানের প্রবর্তন করল, যার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা’র অনুমতি নেই; ফলে যে ব্যক্তি তাকে অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তি তাকে শরীক ও মা‘বুদ হিসেবে গ্রহণ করল; যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবদের প্রসঙ্গে বলেছেন:

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]

“তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে ...।”[৩৫] আয়াত শোনার পর ‘আদী ইবন হাতেম রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তারা তো তাদের ইবাদত বা উপাসনা করে নি, জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

---

[৩৪] সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২১

[৩৫] সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ৩২

«أطاعوهم» (তারা তাদের আনুগত্য করেছে)[৩৬]; যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার অনুমতি বা অনুমোদনের বাইরে দীনের ব্যাপারে কাউকে অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি তার উপাসনা করে এবং তাকে রব হিসেবে গ্রহণ করে। সুতরাং এ থেকে জানা গেল যে, নির্ভেজাল শারীরিক ইবাদতের মধ্যে প্রবর্তিত প্রত্যেকটি বিদ‘আত (নবপ্রবর্তিত বিধান) মন্দ বিদ‘আত (البدعة السيئة) বলে গণ্য হবে।

প্রায়শ অধিকাংশ মানুষ উত্তম (حسنة) ও মন্দ (سيئة) এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না; তারা ধারণা করে যে, এমন প্রত্যেক জিনিস, যাকে তাদের মন ভাল মনে করে এবং যার দিকে তাদের স্বভাব ঝুঁকে পড়ে, তা-ই উত্তম বলে বিবেচিত হবে; এভাবে তারা মন্দকেও উত্তম মনে করে বসে। এভাবে প্রকৃতপক্ষে তারা অন্ধের ন্যায় আন্দাজে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, তারা ধ্বংসাত্মক গর্তের পথ এবং মুক্তির মহাসড়কের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে না।

[বিদ‘আত চেনার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি]

আর এ ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নিয়ম হল এ কথা বলা যে, মানুষ নতুন

[৩৬] ইমাম তিরমিযী অনুরূপ শব্দে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, অধ্যায়: আল-কুরআনের তাফসীর (كتاب تفسير القرآن), পরিচ্ছেদ: সূরা তাওবা থেকে (باب و من سورة التوبة): ৫/২৭২, হাদিস নং- ৩০৯৫, হাদিসটি মাস‘আব ইবন সা‘দের সূত্রে ‘আদী ইবন হাতেম রা. থেকে বর্ণিত; ইমাম তিরমিযী র. বলেন: এটি গরীব হাদিস।

করে কোনো কিছু তখনই উদ্ভাবন করে, যখন তারা সেটাকে যথাযথ ও কল্যাণকর মনে করে, কেননা তারা যদি বিশ্বাস করত যে, তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কিছু আছে, তাহলে তারা তা উদ্ভাবন করত না; সুতরাং যখন মানুষ কোনো কিছুকে যথাযথ ও কল্যাণকর মনে করবে, তখনি সেটার কারণের প্রতিও নজর দিতে হবে; অতঃপর যদি কারণটি এমন বিষয় হয়, যার উদ্ভব হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে, তাহলে প্রয়োজনের দাবি অনুযায়ী নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা বৈধ হবে, যেমন- দলিল-প্রমাণ গ্রন্থবদ্ধ করা; কেননা, এর প্রয়োজনীয় কারণ হল ভ্রান্ত দল ও গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ; সুতরাং তারা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আত্মপ্রকাশ করেনি, তখন তার প্রয়োজন হয়নি। আর যদি এই ধরনের কাজের চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এমন অস্থায়ী কারণে তা পরিত্যাগ করা হয়, যা তাঁর মৃত্যুর কারণে দূর হয়ে গেছে, তাহলে অনুরূপভাবে তা উদ্ভাবন করা বৈধ হবে, যেমন- কুরআন সংকলন করা; কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এই কাজের প্রতিবন্ধকতা ছিল ওহী অবতীর্ণ অব্যাহত থাকা, কেননা আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তা পরিবর্তন করতেন; অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটে।

[বিদ‘আত মানে আল্লাহর দীনকে পরিবর্তন করা]

আর যে কাজের চাহিদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বিদ্যমান ছিল কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার অস্তিত্ব ছাড়াই, অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই কাজটি করেননি, তবে এমন কাজের উদ্ভাবন করা আল্লাহর দীনকে পরিবর্তন করে দেয়, কেননা তাতে যদি কোন কল্যাণ থাকত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতেন এবং তার ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন, আর যখন তিনি তা করেননি এবং সে ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি, তখন বুঝা যায় যে, তাতে কোনো কল্যাণ নেই, বরং তা নিকৃষ্ট ও মন্দ বিদ‘আত।

তার দৃষ্টান্ত হল দুই ঈদের সালাতের পূর্বে আযান দেওয়া, কেননা, যখন কোনো কোনো সম্রাট তার উদ্ভাবন করে, তখন আলেমগণ তার প্রতিবাদ করেছিলেন এবং তারা তাকে মাকরূহ তথা হারাম বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যদি তার বিদ‘আত হওয়াটাই মাকরূহ তথা হারাম হওয়ার দলিল না হত, তাহলে বলা যেতো যে, এটা আল্লাহ তা‘আলার যিকির এবং মানুষকে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের দিকে আহ্বান করা; সুতরাং তাকে জুম‘আর আযানের উপর কিয়াস করা যাবে কিংবা এটাও বলা যেতো যে এটাকে (দুই ঈদের সালাতের পূর্বে আযান দেওয়ার বিষয়টিকে) ব্যাপক নির্দেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الجمعة: ١٠]

“আর তোমরা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর।”[৩৭] অনুরূপ আল্লাহ তা‘আলার অপর ব্যাপক বাণী,

﴿ وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [فصلت: ٣٣]

“আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে আহবান জানায় ...।”[৩৮] কিন্তু আলেমগণ এটা বলেননি, বরং তারা বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন তা যেমন সুন্নাত তেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কাজের চাহিদা থাকা ও প্রতিবন্ধক না থাকা সত্বেও যদি তা পরিত্যাগ করেন তবে সে কাজ পরিত্যাগ করাটাও সুন্নাত। কারণ, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম‘আ’র সালাতের ক্ষেত্রে আযানের নির্দেশ দিয়েছেন আর তিনি দুই ঈদের সালাতের জন্য নির্দেশ দেননি, তখন দুই ঈদের সালাতের জন্য আযান পরিত্যাগ করাটাই সুন্নাত।

আর কারও অধিকার নেই যে, সে তা বৃদ্ধি করবে এবং বলবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোন ক্ষতি হবে না; কারণ তাকে বলা হবে, এভাবে রাসূলদের দীনসমূহ বিকৃত হয়েছে এবং তাঁদের শরী‘আতসমূহ পরিবর্তন হয়ে গেছে; সুতরাং দীনের মধ্যে যদি বৃদ্ধি করাটা বৈধ হয়, তাহলে ফজরের সালাত চার রাকাত এবং যোহরের

---

[৩৭] সূরা আল-জুম‘আ, আয়াত: ১০

[৩৮] সূরা হা-মীম আস-সাজদা/ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৩

সালাত ছয় রাকাত আদায় করা বৈধ হবে, আর বলা হবে- এটা সৎ আমলের বৃদ্ধি, তার বৃদ্ধিতে কোনো ক্ষতি হবে না; কিন্তু কারও জন্য এ কথা বলার অধিকার নেই; কেননা, বিদ‘আত প্রবর্তনকারী যে কল্যাণ ও ফযিলতের কথা ব্যক্ত করে, যদি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে সাব্যস্ত হত এবং তা সত্ত্বেও তিনি তা না করতেন, তাহলে এই ধরনের কাজ পরিত্যাগ করা সুন্নাত, যা প্রত্যেক ব্যাপক নির্দেশ ও কিয়াসের উপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতি আমল করবে এ বিশ্বাস করে যে, তা দীনের মধ্যে অনুমোদিত নয়, সে ফাসিক অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে, বিদ‘আতকারী হিসেবে বিবেচিত হবে না; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার প্রতি আমল করবে এই বিশ্বাস করে যে, তা দীনের মধ্যে অনুমোদিত বিষয়, সে ফাসিক ও বিদ‘আতকারী হিসেবে ধর্তব্য হবে। কারণ, ফিসক বা অবাধ্যতা বিদ‘আতের চেয়েও ব্যাপক; কেননা প্রত্যেক বিদ‘আতই ফিস্‌ক বা অবাধ্যতা, কিন্তু প্রত্যেক ফিস্‌ক বা অবাধ্যতাই বিদ‘আত নয়।

অনুরূপভাবে এটাও বলা হয় যে, বিদ‘আত ফিস্‌ক তথা অবাধ্যতার চেয়ে নিকৃষ্ট; কারণ, যে ব্যক্তি বিদ‘আতপূর্ণ কাজ করে, সে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, যদি তার ধারণায় বিদ‘আতের মাধ্যমে সে তাঁকে সম্মান করছে, কারণ সে মনে করে যে, তার প্রবর্তিত এ বিদ‘আত সুন্নাতের চেয়ে উত্তম ও সঠিক হওয়ার অধিক যুক্তিযুক্ত। এভাবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী বলে গণ্য হবে; কারণ শরী‘আত যা অপছন্দ করেছে এবং যা থেকে নিষেধ করেছে, সে তাকে উত্তম মনে

করেছে; আর তা হল দীনের মধ্যে নতুন কিছুর প্রবর্তন করা; অথচ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জন্য এমন ইবাদত বিধিবদ্ধ করেছেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট, তাদের দীন হিসেবে পরিপূর্ণ এবং তাদের প্রতি তাঁর প্রদত্ত নিয়ামত হিসেবে সম্পূর্ণ, যেমনটি তিনি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ কিতাবের মধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেন:

﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي ﴾ [المائدة: ٣]

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম ...।”[৩৯] সুতরাং পরিপূর্ণতার উপর বৃদ্ধি করা এক ধরনের ত্রুটি এবং অতিরিক্ত আঙুলের মতই বেমানান। আর সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় হকপন্থীদের মতে, ইবাদতের ভাল ও মন্দ জানা যাবে কেবল শরী‘য়তের মাধ্যমে, আকল বা যুক্তির মাধ্যমে নয়[40]; সুতরাং এমন প্রত্যেকটি কাজ, যা করার ব্যাপারে শরী‘য়তে নির্দেশনা রয়েছে, তা উত্তম কাজ; আর এমন প্রত্যেকটি কাজ, যা করার ব্যাপারে শরী‘য়তে নিষেধ করা রয়েছে, তা মন্দ কাজ।

---

[৩৯] সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৩

[40] বিষয়টি এভাবে না বলে যদি বলা হতো যে, শরীয়ত যার নির্দেশ দিয়েছে তা সুন্দর আর যা থেকে নিষেধ করেছে তা অসুন্দর, তবে ভালো হতো, কারণ, সঠিক মতে, সুন্দর অসুন্দর নির্ধারণের বিবেকেরও কিছু ক্ষমতা রয়েছে। তবে সেটা ইবাদত সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। সেটা দুনিয়াবী কাজে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এটাই হচ্ছে সহীহ আকীদা। [সম্পাদক]

ইমাম গাযালী র. তাঁর ‘আল-আরবা‘ঈন ফী উসূলিদ্দীন’ (الأربعين في أصول الدين) নামক গ্রন্থে বলেন: “তুমি অবশ্যই বেঁচে থাক তোমার বুদ্ধি বা যুক্তির দ্বারা সবকিছু বিচার করা থেকে, আরও বেঁচে থাক ‘প্রত্যেক কল্যাণকর ও উপকারী বস্তুই উত্তম, আর যা কিছু অধিক পরিমাণে হবে, তাই অধিক উপকারী হবে’ এমন কথা বলা থেকে। কারণ, তোমার বুদ্ধি স্রষ্টার নির্দেশাবলীর রহস্য উদঘাটনে সক্ষম নয়; বরং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শক্তিই অনুধাবন করতে পারে; সুতরাং তোমার উপর আবশ্যকীয় কর্তব্য হল অনুসরণ করা; কারণ, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুমি কিয়াসের মাধ্যমে বুঝতে পারবে না; তুমি কি দেখনি, কিভাবে তোমাকে সালাতের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয়েছে অথচ গোটা দিনব্যাপী তা আদায় করা থেকে তোমাকে নিষেধ করা হয়েছে। তোমাকে তা পরিত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুবহে সাদিক ও আসরের পরে এবং সূর্য উদয়, অস্ত ও পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার সময়; আর এটার পরিমাণ হচ্ছে দিনের একতৃতীয়াংশের মত সময়।”

[প্রবৃত্তির অনুসরণ ও আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকে বিচারক হিসেবে মানা থেকে সতর্ক করা]

আর তিনি (গাযালী) ‘এহইয়াউ ‘উলুমিদ্দীন’ (إحياء علوم الدين) গ্রন্থে বলেন: যেমনিভাবে ঔষধের উপকারিতা উপলব্ধি করতে বিবেক স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, যদিও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করার দ্বারাই সেটা নির্ধারিত হয়, তেমনিভাবে বিবেক আখিরাতে যা উপকার করবে তা জানতে

অপারগ, কারণ সেটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করার সুযোগ নেই। এটা শুধু সম্ভব হবে যদি আমাদের নিকট কিছু সংখ্যক মৃতব্যক্তি ফিরে আসে এবং তারা আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী করে এমন আমল ও তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন আমল সম্পর্কে জানিয়ে দেয়; আর এটা আশা করার কোনো সুযোগ নেই।

'মাজমাউল বাহরাইন' গ্রন্থকার তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, একলোক ঈদের দিন ময়দানে ঈদের সালাতের আগে কিছু সালাত আদায় করতে চাইলে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে নিষেধ করেন। তখন লোকটি বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি অবশ্যই জানি যে আল্লাহ আমাকে সালাত আদায় করার কারণে আযাব দিবেন না, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, আর আমিও জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যে কোনো কাজেরই সাওয়াব দেন না, যতক্ষণ না তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম করবেন বা তিনি তা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন। সুতরাং তোমার সালাত বেহুদা কাজ হয়ে যাবে, আর বেহুদা কাজ করা হারাম। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর বিরোধিতার কারণে তোমাকে শাস্তি দিবেন।"।

'হেদায়া' গ্রন্থকার বলেন: "সুবহে সাদিকের পরে ফযরের দুই রাকাতের চেয়ে অতিরিক্ত নফল সালাত আদায় করা মকরূহ; কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের প্রতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি দুই রাকাতের বেশি আদায় করেননি।"

সুতরাং লক্ষ্য করুন, কিভাবে ইবাদত অধ্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোনো কাজ না করাকে মাকরূহের উপর দলিল হিসেবে তিনি উল্লেখ করলেন।

[দীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা]

ইবনুল হাম্মাম বলেন: যখন কোনো ইবাদতে ওয়াজিব ও বিদ‘আতের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন সতর্কতার খাতিয়ে তা করা হবে; কিন্তু যদি বিদ‘আত ও সুন্নাতের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিবে, তখন তা পরিত্যাগ করবে; কারণ, বিদ‘আত ত্যাগ করা আবশ্যক, আর সুন্নাত আদায় করা আবশ্যক নয়।

অবশ্য ‘আল-খোলাসা’ গ্রন্থকারের একটি মাস‘আলা প্রমাণ করে যে, ওয়াজিব তরক (ত্যাগ) করার চেয়ে বিদ‘আত অনেক বেশি ক্ষতিকর, যেমন তিনি বলেন: যখন কেউ তার সালাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে কি তা সালাত আদায় করেছে, নাকি আদায় করেনি? এমতাবস্থায় সে যদি ওয়াক্তের মধ্যে থাকে, তাহলে পুনরায় তা আদায় করে নেবে; আর যদি সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, অতঃপর সে সন্দেহ করে, তাহলে কিছুই করতে হবে না। তবে যদি আসরের সালাত (পড়েছে কি পড়েনি) এর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, তাহলে সে (যখন দ্বিতীয়বার তা আদায় করবে তখন) প্রথম ও তৃতীয় রাকাতে পাঠ করবে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাতে পাঠ করবে না; কারণ, ফরয সালাতের ক্ষেত্রে কিরাআতের জন্য প্রথম দুই রাকআতকে নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব; পক্ষান্তরে নফল সালাতে প্রতি

দু’রাকাতেই কিরাআত মেলাতে হয়, তাই যদি পরপর দু’ রাকাআতে কিরাআত পড়া হয়, তখন কোনো কারণে পূর্বে সে যদি ফরয সালাত আসলেই পড়ে থাকে তবে তো সেটা নফল হিসেবে ধর্তব্য হয়ে যাবে, অথচ আসরের পরে কোনো নফল সালাত আদায় করা মাকরূহ, তাই তাকে পরপর প্রতি রাকআতে সূরা মিলিয়ে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে করে দ্বিতীয়বার পড়া সালাতটি কোনো ক্রমেই ফরয না হয়ে নফল সালাত হিসেবে ধর্তব্য না হয়। কারণ যদি আসরের পরে নফল সালাত আদায় করা হয় সেটি হবে বিদ‘আত, যা অপছন্দনীয়।

আর সুফিয়ান সাওরী র. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন: “ইবলিসের নিকট সকল পাপের চেয়ে বিদ‘আতই সবচেয়ে বেশি প্রিয়; কারণ, পাপ থেকে তাওবা করা হয়, আর বিদ‘আত থেকে তাওবা করা হয় না।”[৪১]

[বিদ‘আতের ভয়াবহতা]

এর কারণ হল, অপরাধী ব্যক্তি জানে যে, সে অপরাধের সাথে জড়িত, ফলে তার পক্ষ থেকে আশা করা যায় যে সে তা থেকে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কিন্তু বিদ‘আতের অনুসারী বিশ্বাস

---

[৪১] আবূ না‘ঈম, আল-হিলিয়্যা (الحلية), ৭/২৬, ইয়াহইয়া ইবন ইয়ামানের সূত্রে সুফিয়ান সাওরী থেকে বর্ণিত, তার শব্দগুলো হল: " البدعة لا يتاب منها "(বিদ‘আত থেকে তাওবা করা হয় না)।

করে যে, সে আনুগত্য ও ইবাদতের মধ্যেই আছে, ফলে সে তাওবা করে না এবং ক্ষমাও প্রার্থনা করে না। আর এটাই ইবলিস থেকে বর্ণনা করা হয় যে, সে বলে: "আমি আদম সন্তানদের পিঠ ভেঙ্গে দেই অপরাধ ও পাপরাশি দ্বারা, আরা তারা আমার পিঠ ভেঙ্গে দেয় তাওবা ও ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা করার) দ্বারা; তাই আমি তাদের জন্য এমন কতগুলো অপরাধের প্রবর্তন করি, যার থেকে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে না এবং তার থেকে তারা তাওবাও করে না; আর সেগুলো হল ইবাদতের আকৃতিতে বিদ'আত।"

[একটি সন্দেহ অপনোদন]

যদি বলা হয় যে, অনেক মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে যে, তাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি হাদিসের দ্বারা তারা তাদের অভ্যাসে পরিণত হওয়া বিদ'আতকে মাকরূহ না হওয়ার ব্যাপারে দলিল পেশ করে থাকে, সে হাদিসটি হল:

«مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ»

"মুমিনগণ যা উত্তম বলে মনে করেন, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর মুসলিমগণ যা মন্দ বলে মনে করেন, তা আল্লাহর নিকট মন্দ"! এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের পক্ষ থেকে এর দ্বারা যুক্তি প্রদর্শন শুদ্ধ হবে, নাকি অশুদ্ধ হবে?

[উত্তর] কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ যা আলোচনা করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে এর জবাব হল: এই যুক্তি প্রদর্শন বিশুদ্ধ নয়, আর হাদিসটি তাদের বিপক্ষে দলিল, তাদের পক্ষে নয়; কারণ, তা ইবনু মাস‘উদ রা. থেকে বর্ণিত মাওকুফ[৪২] হাদিসের অংশবিশেষ, যা আহমদ, বায্যার, তাবারানী, তায়ালাসী ও আবূ নু‘আইম বর্ণনা করেছেন; হাদিসটি এই রকম:

« إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه و سلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيِّئ » . (أخرجه أحمد) .

“নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, অতঃপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তাঁকে তিনি তাঁর নিজের জন্য নির্বাচন করেছেন, অতঃপর তাঁকে তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন; অতঃপর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরের পর (বাকি) বান্দাদের অন্তরসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, তারপর তিনি বান্দাদের

---

[৪২] যে হাদিসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে ‘মাওকুফ’ হাদিস বলে, অর্থাৎ সাহাবীদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে ‘মাওকুফ’ হাদিস বলা হয় । -অনুবাদক।

অন্তরসমূহের মধ্যে তাঁর সাহাবীদের অন্তরসমূহকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজির বা সাহায্যকারী বানালেন, যারা তাঁর দীনের জন্য লড়াই করবে; সুতরাং মুসলিমগণ যা উত্তম বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর মুসলিমগণ যা মন্দ বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ।”[৪৩]

কোনো সন্দেহ নেই যে, " المسلمون " শব্দের মধ্যে " ال " টি সাধারণভাবে গোটা (মুসলিম) জাতিকে বুঝানোর জন্য নয়; কারণ, হাদিসটি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিরোধী হয়ে যাবে, তিনি বলেছেন:

« سَتَفْتَرِقُ أمتي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرقة ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِى النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَهِىَ الْجَمَاعَةُ » . (أخرجه أبو داود) .

“অচিরেই আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, তাদের বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে, আর একটি দল জান্নাতে যাবে, আর

[৪৩] আহমদ, মুসনাদ (মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রা.), হাদিস নং- ৩৬০০; আবূ নু‘আইম, মা‘রেতুস সাহাবা [معرفة الصحابة], (১/১৪২), হাদিস নং- ৪৭, হাদিসটি ‘আসেমের সূত্রে আবূ ওয়ায়েল থেকে- আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রা. থেকে বর্ণিত এবং ‘আসেমের সূত্রে যার‘আ থেকে- আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রা. থেকে বর্ণিত, তার সনদটি হাসান।

সে দলটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত।"[88] কেননা, উম্মতের প্রতিটি ফিরকা বা দলই মুসলিম, সে তার মাযহাবকে উত্তম মনে করে, সুতরাং যদি সবার ভালো মনে করা ও সবার কথাই গ্রহণযোগ্য হয় তবে তো কোনো দলই জাহান্নামী না হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা হাদীসের ভাষ্যের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে মুসলিমদের কেউ কেউ কোনো জিনিসকে উত্তম মনে করে, আবার তাদের কেউ কেউ সেই জিনিসটিকেই মন্দ মনে করে, এমতাবস্থায় (যদি সবার কথাই গ্রহণযোগ্য হয়, তবে) তো উত্তম থেকে মন্দ আলাদা না করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যা হাদীসের ভাষ্যের পরিপন্থী। তাই বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে,

- হাদীসে বর্ণিত, "المسلمون" শব্দের মধ্যকার "ال" টি "عهد" বা পূর্বে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে। এখানে পূর্ববর্ণিত বিষয়

---

[88] আবূ দাউদ (৫/৪), হাদিস নং- ৪৫৯৬, সুন্নাহ অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সুন্নাহ'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (باب شَرْحِ السُّنَّةِ); তিরমিযী (৫/২৫), হাদিস নং- ২৬৪০, ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: এই উম্মতের বিভক্তি প্রসঙ্গে যেসব বর্ণনা এসেছে (باب ما جاء في افتراق هذه الأمة), আর তিনি বলেছেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ; ইবনু মাজাহ (২/১৩২১), হাদিস নং- ২৩৯১, ফিতনা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: উম্মতের বিভক্ত হওয়া প্রসঙ্গে (باب افتراق الأمم); তাদের সকলেই আবূ সালমা'র সূত্রে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; আর আলবানী 'সহীহ আল-জামে' আস-সাগীর' (صحيح الجامع الصغير) –এর মধ্যে (১/২৪৫) হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদিস নং- ১০৮৩

হচ্ছে, "তারপর তিনি বান্দাদের অন্তরসমূহের মধ্যে তাঁর সাহাবীদের অন্তরসমূহকে সর্বোত্তম পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তাদেরকে তাঁর নবীর উজির বা সাহায্যকারী বানালেন"। অর্থাৎ হাদীসে মুসলিমগণ বলে সাহাবীগণকেই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

- অথবা " المسلمون "শব্দের মধ্যকার " ال " টি দ্বারা "خصائص الجنس" বা মুসলিম শব্দের মুসলিম জাতির অন্তর্নিহিত কোনো বৈশিষ্ট্যকে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। তখন মুসলিম বলে বুঝানো হবে ইসলামের গুণে পরিপূর্ণ ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা ইজতেহাদ করত সক্ষম। এর মাধ্যমে সাধারণগুণ বিশিষ্টকে পূর্ণাঙ্গ গুণবিশিষ্টদের সম্পৃক্ত করা হবে। কারণ, ইঙ্গিত না পাওয়াকালীন সময়ে মুতলাক (مطلق) তথা সার্বজনীন বিষয়টি একটি পরিপূর্ণ শ্রেণীর দিকে স্থানান্তরিত হবে, আর সে শ্রেণি হলো মুজতাহিদ তথা গবেষক শ্রেণী; সুতরাং হাদীসের সঠিক অর্থ হবে: সাহাবীগণ অথবা মুসলিমদের মুজতাহিদগণ যা উত্তম মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর সাহাবীগণ অথবা মুসলিমদের মুজতাহিদগণ যা মন্দ বলে মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ।
- তাছাড়া " المسلمون "শব্দের মধ্যকার " ال " টিকে তার প্রকৃত "استغراق" বা এক জাতীয় সকল ব্যক্তি বা বস্তুর অর্থে ব্যবহার করাও বৈধ হবে, তখন তার অর্থ হবে: "যা সকল মুসলিম উত্তম মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট উত্তম; আর যা সকল মুসলিম মন্দ মনে করবে, তা আল্লাহর নিকট মন্দ। আর যে ব্যাপারে

মতবিরোধ হবে, সেক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য বিষয় হবে সেসব যুগের ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যে যাদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, ঐসব যুগের ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য নয়, যাদের ব্যাপারে মিথ্যবাদিতা ও অনির্ভরযোগ্যতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তিনি বলেছেন:
«خَيْرُ القرون قَرْنِى الذي بعثتُ فيه ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يفشو الكذب ».

"আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, যাতে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, অতঃপর মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে।"[৪৫] সুতরাং (যাদের মধ্যে মিথ্যা ছড়িয়ে পড়বে) তোমরা তাদের কথা ও কর্মকাণ্ডসমূহের উপর আস্থা স্থাপন বা নির্ভর করো না। আর কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবী, তাবে'য়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ একান্ত

---

[৪৫] বুখারী (৫/৩০৬), হাদিস নং- ২৬৫২, অধ্যায়: সাক্ষ্য (كتاب الشهادات), পরিচ্ছেদ: অন্যায়ের পক্ষ্যে সাক্ষী করা হলেও সাক্ষ্য দেবে না (باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد); মুসলিম (৪/১৯৬৩), হাদিস নং- ২৫৩৩, অধ্যায়: সাহাবীদের ফাদায়েল প্রসঙ্গে (فضائل الصحابة), পরিচ্ছেদ: সাহাবীদের ফযীলত, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, অতঃপর তাদের সাথে যারা সম্পৃক্ত হবে, তাদের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে (باب فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ), হাদিসটি 'উবায়দা সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ রা. থেকে মারফু' সনদে বর্ণিত।

অত্যাবশ্যকতার সীমা অতিক্রমকারী বিদ‘আতকে মন্দ ও ঘৃণিতই মনে করতেন, সুতরাং সে-সব বিদ‘আত আল্লাহ ত‘আলার নিকটও মন্দ।

বস্তুত আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপর বাণীর মত, যেখানে তিনি বলেছেন:

« لا تجتمع أمتي على الضلالة » .

“আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না।”[৪৬] এই হাদিসেও ‘উম্মত’ বলতে কেবল ‘আহলুল ইজমা’ (যাদের ইজমা বা ঐকমত্য

[৪৬] ইবনু আবি ‘আসেম, আস-সুন্নাহ (১/৪১), হাদিস নং- ৮২, তিনি হাসানের সূত্রে কা‘ব ইবন ‘আসেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: « إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على الضلالة » (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন)। আর আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন; আর হাদিস নং- ৮৩ কাতাদার সূত্রে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: « إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على الضلالة » (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন)। আর হাদিস নং- ৮৪ আবূ খালফ আল-আ‘মা সূত্রে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: « إن أمتي لا تجتمع على الضلالة ... » (নিশ্চয়ই আমার উম্মত

গ্রহণযোগ্য এমন লোকগণ) উদ্দেশ্য, যিনি হবেন এমন মুজতাহিদ (দ্বীনী গবেষক), যার মধ্যে আসলেই কোনো প্রকার ফাসেকী (পাপাচারিতা) ও বিদ‘আত নেই; কারণ, ফিসক তথা পাপাচার যে তা করে সে ব্যক্তিকে অপবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং তা ন্যায়পরায়ণতাকে বিদূরিত করে, আর বিদ‘আতপন্থী ব্যক্তি মানুষকে বিদ‘আতের দিকে আহ্বান করে এবং সে সাধারণভাবে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; কেননা, সাধারণ উম্মত দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে বুঝানো হয়, আর তারা হলেন এমন উম্মত, যাদের পথ হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পথ, বিদ‘আতপন্থী ও পথভ্রষ্টদের পথ নয়, যেমনটি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম:

« أمتي من استن بسنتي »

“আমার উম্মত হল সেই ব্যক্তি, যে আমার সুন্নাতকে অনুসরণ করে।”[৪৭]

ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না ...)। এবং আলবানী তাকে দূর্বল বলেছেন। আর আলবানী ‘সহীহ আল-জামে‘’ (صحيح الجامع) –এর মধ্যে (১/৩৬৭) কা‘ব ইবন ‘আসেম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন, হাদিস নং- ১৭৮৬।

[৪৭] এই হাদিসের (সনদ বা বিশুদ্ধতার) ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই। তবে সূয়ূতী তার দুররুল মানসূরে (৩/১৪৭) আবদুর রাযযাক তার মুসান্নাফ (৬/১৬৯) এর

তবে ("আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না" হাদীসে) 'আমার উম্মত' (أمتي) দ্বারা সকল উম্মতকে উদ্দেশ্য করাও শুদ্ধ বলা যায়, কারণ কখনও কখনও " إضافة " বা সম্বন্ধ পদ "ال" এর মত "استغراق" তথা সমস্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে; সুতরাং অর্থ হবে: "আমার সকল উম্মত মহাকালের কোনো এক কাল বা সময়ে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না, যেমনভিাবে ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানগণ তাদের নবীদের পরে ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে"; তখন এই হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, যাতে তিনি বলেছেন:

« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ » . (أخرجه البخاري و مسلم) .

"আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে; যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো প্রকার অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত

বরাতে আইয়ূব আস সাখতিয়ানী থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, «من اسْتَنَّ بِسنتي فَهُوَ مني» "যে আমার সুন্নাত অনুসারে চলে সে আমার দলভুক্ত"। তবে সেটি মুরসাল। তাছাড়া আবু আমর আল-আদনী তার কিতাবুল ঈমানে (হাদীস নং ৫০) একই বর্ণনা হাসান বসরী থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তাও মুরসাল। [সম্পাদক]

এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামত এসে পড়বে, আর তারা তখনও লোকের উপর সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান থাকবে।”[৪৮]

[বিদ‘আত থেকে সতর্ক করার আবশ্যকতা]

যখন এটা (বিদ‘আত নিন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি) সুসাব্যস্ত হলো, তখন বর্তমান কালের প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর অপরিহার্য হলো, কোনো প্রকার বিদ‘আতের দিকে ঝুঁকে পড়া ও তা দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া থেকে নিজেকে হেফাযত করা এবং তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত অভ্যাস বা প্রথা থেকে রক্ষা করা, যাতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং যার উপর সে বেড়ে উঠেছে। কারণ, তা হচ্ছে প্রাণহারী বিষ; খুব কম লোকই এই ধরনের মহামারী থেকে বাঁচতে পারে এবং খুব কম লোকের কাছেই সেগুলোর সত্য বিষয়টি ফুটে উঠে।

---

[৪৮] বুখারী (২/২৫০), হাদিস নং- ৩১১৬; অধ্যায়: খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ (كتاب الخمس), পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: "فأن لله خمسه وللرسول " (নিশ্চয়ই তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য) মুসলিম (৩/১৫২৪), হাদিস নং- ১০২৭, ইমারত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ » (আমার উম্মতের এক দল লোক হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরোধীরা তাঁদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না); হাদিসটি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত।

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, কুরাইশগণ তাদের প্রাণের সাথে মিশে যাওয়া স্বভাব-চরিত্র তথা প্রথার কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হিদায়াত ও দলিল-প্রমাণ নিয়ে এসেছেন, তারা তা অস্বীকার করেছিল, আর এটাই ছিল তাদের কুফরী ও সীমালংঘন করার অন্যতম কারণ। এমনকি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যা যা বলেছে তার কারণ তো শুধু এই যে, তারা যেসব প্রথার উপর বেড়ে উঠেছে এবং যেটার উপর তারা বড় হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত হিদায়াত তার বিপরীতে ছিল। আর এজন্যই আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রা. বলতেন:

«إياكم و ما يحدث من البدع فإن الدين لا يذهب بمرة من القلوب، بل الشيطان يحدث لكم بدعا حتى يذهب الإيمان من قلوبكم » .

“তোমরা নবউদ্ভাবিত বিদ‘আত থেকে বেঁচে থাক; কারণ, নিশ্চয় হৃদয় থেকে দ্বীন একবারে ছিনিয়ে নেওয়া হয় না, বরং শয়তান তোমাদের জন্য বহু ধরনের বিদ‘আতের উদ্ভাবন করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তোমাদের অন্তর থেকে ঈমান চলে যাবে”।

এর উপর ভিত্তি করে মুমিনের উচিত হবে, কোনো বিষয়ে তার শক্তিশালী সুদৃঢ় সংকল্প ও এর দ্বারা অধিক ইবাদত করা দ্বারা এ ধোঁকা না খাওয়া যে, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। কারণ, সে ব্যাপারে তার দৃঢ়তা এবং তাকে করাত দিয়ে ছিড়ে ফেললেও তার থেকে তার ফিরে না আসা এটা প্রমাণ করে না যে, সে তার দীনের ব্যাপারে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; কেননা সে ব্যাপারে তার দৃঢ়তা ও

শক্ত অবস্থান সেটি সত্য হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং তা হচ্ছে তার এমন এক জাতির মাঝে বেড়ে উঠার কারণে, যারা এটাকে দীন হিসেবে গ্রহণ করেছে। বস্তুত কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প ও শক্ত অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে জন্ম ও মেলামেশার একটা বড় প্রভাব রয়েছে, চাই তা সত্য হউক অথবা বাতিল হউক। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, এই ধরনের দৃঢ়তা ও একগুয়েমী সকল গণ্ড মূর্খ ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়, যেমন ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও তাদের মত ব্যক্তিদের মধ্যে।

সুতরাং সাবধান হও! সতর্ক হও এই প্রাণহারী বিষের ব্যাপারে; আর ধাবিত হও সত্যের দিকে, অনুপ্রাণিত হও সুন্নাহ'র অনুসরণ ও বিদ'আত ত্যাগ করার মাধ্যমে তোমার আনন্দ ও সৌন্দর্যকে নির্ভেজাল করার জন্য; কারণ, সুন্নাহ'র অনুসরণ করাটাই সর্বোত্তম আমল, এ যুগে কোনো ব্যক্তির উচিত এ কাজটিই করা, যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে সুন্নাহ বিরোধী কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করেছে। তোমার জন্য আবশ্যক হল, বিদ'আত তথা দীনের মধ্যে নবপ্রবর্তিত বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আপোষহীন হওয়া, যদিও এসব কোনো কোনো বিদ'আতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে! সাহাবীগণের পরে যা নতুনভাবে প্রবর্তন করা হয়েছে, তার ব্যাপারে তাদের ঐক্যমত যেন তোমাকে কোনোভাবেই প্রতারিত করতে না পারে, বরং তোমার জন্য উচিত হবে তাঁদের (সাহাবীদের) অবস্থা ও কর্মকাণ্ডসমূহ অনুসন্ধানের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া; কারণ, মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক জ্ঞানী ও আল্লাহ তা'আলার অধিক

নিকটবর্তী, যে তাঁদের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তাঁদের জীবনপদ্ধতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত; কেননা তাঁদের কাছ থেকে দীন গ্রহণ করা হয়েছে, আর শরী'য়ত প্রবর্তকের নিকট থেকে শরী'য়ত পরিবহনের ক্ষেত্রে তাঁরাই হলেন মূল বাহক। হাদিসে এসেছে:

« إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم » .

"যখন মানুষ মতবিরোধ করবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতকে গ্রহণ করা।"[৪৯] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল সত্য ও তার অনুসরণের আবশ্যকতা, যদিও সত্য অবলম্বনকারীগণ সংখ্যায় কম হউক এবং তার বিরোধীরা সংখ্যায় বেশি হউক! তবে

---

[৪৯] ইবনু মাজাহ (২/১৩০৩), হাদিস নং- ৩৯৫০, ফিতনা অধ্যায় (كتاب الفتن), পরিচ্ছেদ: সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের (মতামত) প্রসঙ্গে (باب السواد الأعظم), হাদিসটি আবূ খালফ আল-আ'মা সূত্রে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' সনদে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: « إن أمتي لا تجتمع على ضلالة . فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم» (নিশ্চয়ই আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। সুতরাং তোমরা যখন মতবিরোধ লক্ষ্য করবে, তখনতোমাদের কর্তব্য হল সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের মতকে গ্রহণ করা)। 'আয-যাওয়ায়েদ' (الزوائد) নামক গ্রন্থের মধ্যে আছে, এই হাদিসের সনদের মধ্যে আবূ খালফ আল-আ'মা নামে একজন বর্ণনাকারী আছে, যার প্রকৃত নাম হাযেম ইবন 'আতা, তিনি দুর্বল; আর এ হাদিসটি আরও কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, প্রতিটি সনদেই ত্রুটি রয়েছে, ইরাকী বায়যাভী'র হাদিসসমূহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এমন কথা বলেছেন।

সঠিক বিষয় হল, যার উপর প্রথম জামা'য়াত বা দল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আরা তাঁরা হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ এবং তাঁদের পরবর্তীতে বাতিলের সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বা বিবেচিত হবে না। তাই তো ফুদাইল ইবন 'ইয়াদ বলেন, যার অর্থ হচ্ছে: "তুমি হিদায়েতের পথে অবস্থান কর, সুন্নাহ'র অনুসারীদের সংখ্যার স্বল্পতা তোমার ক্ষতি করবে না; আর ভ্রষ্টপথ পরিহার কর, ধ্বংসশীলদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রতারিত হবে না।"

পূর্ববর্তী আলেমদের কেউ কেউ বলেন: "যখন তুমি শরী'য়ত অনুযায়ী চল এবং প্রকৃত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তখন তুমি কোনো পরোয়া করবে না, যদিও গোটা সৃষ্টিজগৎ তোমার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে।"

ইবনু মাস'উদ রা. বলেন: "তোমরা এমন যামানায় অবস্থান করছ, যাতে তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি কাজের ক্ষেত্রে দ্রুতগতি সম্পন্ন; আর তোমাদের পরে অচিরেই এমন এক সময় আসবে, যাতে তাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি অধিক হারে সন্দেহ-সংশয়ের কারণে কাজের ক্ষেত্রে থমকে দাঁড়াবে।"

ইমাম গাযালী র. বলেন: তিনি (ইবন মাসউদ রা.) সত্য বলেছেন; কারণ, এ যামানায় যে ব্যক্তি (হকের ব্যাপারে) দৃঢ়তা অবলম্বন করবে না, বরং অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে এবং তারা যাতে নিমগ্ন থাকবে সেও তাতে মগ্ন থাকবে, তাহলে সে ধ্বংস

হবে, যেমনিভাবে তারা ধ্বংস হয়েছে। কারণ, দীনের মূল, খুঁটি ও ভিত্তি অধিক ইবাদত, তিলাওয়াত ও খেয়ে না খেয়ে চেষ্টাসাধানা করার নাম নয়; বরং দীন হল তার উপর আপতিত বিদ‘আত ও নবপ্রবর্তিত শর‘য়ী বিধানের মত যাবতীয় দুর্যোগ ও ব্যাধি থেকে তাকে সংরক্ষণ করা। কারণ, তার (এসব বিদ‘আতের) আধিক্য ও বিস্তৃতির কারণে মনে হচ্ছে যেন তা দীনের নিদর্শনসমূহের অন্যতম প্রতীকে পরিণত হয়েছে অথবা (সে বিদ‘আতগুলো) যেন তা হয়ে গেছে আমাদের উপর ফরয করা বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

[প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে সতর্ক করা]

কিন্তু হায়! আমরা যখন সেসব বিদ‘আতের কাজ করি তখন যদি অনুধাবন করতে পারতাম যে, এটি বিদ‘আত; কেননা, যদি আমাদের মধ্যে এ অনুভূতি আসত, তবে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করাটা আশা করা যেত, কিন্তু আমরা তাকে গ্রহণ করেছি আনুগত্য ও ইবাদতরূপে এবং তাকে আমরা আমাদের দীনে পরিণত করেছি। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের সেসব পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি ও আদর্শ বানিয়েছি, যারা হয়তো ভুলে গেছে অথবা ভুল করেছে, অথবা অসতর্কতাবশত তাদের থেকে তা সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর যখন কোনো ব্যক্তি এসে আমরা যেসব বিদ‘আতপূর্ণ কর্মকাণ্ডসমূহে জড়িয়ে গেছি, সে ব্যাপারে আমাদের উপর প্রতিবাদ করে; তখন সে ব্যক্তির জন্য যদি আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধাবোধ থাকে, তাহলে আমরা তাকে বলি: এটা জায়েয, অমুক ব্যক্তি তার বৈধতার ব্যাপারে মত দিয়েছেন

এবং তাকে আমরা আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এমন কিছু সংখ্যক ব্যক্তির কথা বলে দেই, যারা (সঠিক বিষয়টি) ভুলে গেছে অথবা ভুল করেছে, অথবা অসতর্ক হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি প্রতিবাদকারীর জন্য আমাদের অন্তরে কোনো শ্রদ্ধাবোধ না থাকে, তাহলে সে আমাদের পক্ষ এমন কথা শুনে, যা সে ধারণা করেনি এবং তার হৃদয়ে কল্পনাও করেনি। আর এ সবকিছুই মূলত আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত জাহিলিয়াত তথা মূর্খতার কারণে সংঘটিত হয। কেননা আমরা নিজেরা যে মূর্খতার উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, তা যদি উপলব্ধি করতে পারতাম, তাহলে যিনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন, তার জবাব আমরা গ্রহণ করে নিতাম এবং যে ব্যক্তি (সঠিক বিষয়টি) ভুলে গেছে অথবা ভুল করেছে, অথবা অসতর্কতাবশত করেছে, তাকে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে দলিল হিসেবে পেশ করতাম না; কারণ, মানুষের জন্য তার দীনের ব্যাপারে নিষ্পাপ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে অনুসরণ করা বৈধ নয়, আর নিষ্পাপ ব্যক্তি হলেন শরী'য়তপ্রবর্তক (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), অথবা সে অনুসরণ করবে শরী'য়তপ্রবর্তক যাকে উত্তম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাকে। আর তাঁরা হলেন তিন যুগের বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ, শরী'য়তপ্রণেতা তার বিজ্ঞ সিদ্ধান্তে যাঁদের প্রত্যেক যুগকে বিশেষ মর্যাদায় বিশেষিত করেছেন।

[তিন যুগের মর্যাদা]

তন্মধ্যে প্রথম যুগের লোকজনকে আল্লাহ এমন এক বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষিত করেছেন, সে ক্ষেত্রে তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ অন্য কারও নেই, তাদের সাথে যুক্ত হওয়ারও কোনো পথ নেই; যেহেতু তাঁরা তাঁর নবীকে এবং তাঁর প্রতি আল-কুরআন নাযিলের দৃশ্যকে অবলোকন করেছেন এবং তা সংরক্ষণ করার জন্য তাঁদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যাতে একটি বর্ণও বিনষ্ট না হয়, অতঃপর তাঁরা তা একত্রিত করেছেন এবং তাকে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের নবীর হাদিসসমূহকে তাঁদের হৃদয়ে সংরক্ষণ করেছেন এবং তাকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন; আর এই দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁরা এমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, যা আয়ত্ত করা এবং সে অবস্থানে পৌঁছা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে তাদের নবীর উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

তারপর তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলেন তাবে'য়ীগণ; তাঁরা যেসব হাদিস ও দীনের মাসআলা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, সেগুলো সংকলন করেছেন এবং সাহাবীদের নিকট থেকে শরী'য়তের হুকুম-আহকাম ও তাফসীর বর্ণনা করেছেন, এমনকি তাঁদের কেউ কেউ একটি হাদিস ও একটি মাসআলার সন্ধানে এক মাস অথবা দুই মাসের পথ ভ্রমণ করেছেন। আর তাঁরা শরী'য়তের বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করেছেন; সুতরাং এই দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁদেরও অনেক মর্যাদা হাসিল হয়েছে।

অতঃপর তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হলেন তাবে-তাবে'য়ীগণ (তাবে'য়ীগণের অনুসারীগণ), যাঁদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছে নির্ভরযোগ্য ফকীহগণ; অতঃপর তাঁরা আল-কুরআনকে সহজ সংকলন অবস্থায় পেয়েছে, আর হাদিসসমূহকে পেয়েছে গচ্ছিত ও সুবিন্যস্ত অবস্থায়; ফলে তাঁরা শরী'য়তের নিয়মকানুনের দাবি অনুযায়ী কুরআন ও হাদিস বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার থেকে মূলনীতিমালা অনুযায়ী বিধিবিধান উদ্ভাবন করেছেন এবং দলিল-প্রমাণসমূহের কারণ নির্ণয় করেছেন ও মানুষের জন্য তা সহজ করেছেন; আর তাঁদের কারণে পরিস্থিতি সুশৃঙ্খল হয়েছে এবং উম্মতে মুহাম্মদী'র দীন স্থিতিশীল হয়েছে; ফলে এই দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁদের জন্যও অনেক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হাসিল হয়েছে।

অতঃপর তাঁরা যখন তাঁদের পথে চলে গেলেন, তখন তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের আগমন হল, এ প্রজন্ম বাস্তবায়ন করার মত কোনো দায়িত্বই পেল না, বরং তারা সে বিষয়টিকে পরিপূর্ণ অবস্থায় পেল; পূর্ববর্তীগণ যা উদ্ভাবন ও বর্ণনা করেছেন, তাদের জন্য তা সংরক্ষণ ও আত্মস্থ করা ছাড়া আর কোন দায়িত্বই অবশিষ্ট রইল না। ফলে এটা স্থিরিকৃত হয়ে গেল যে, পূর্ববর্তীদের অনুসরণ, অনুকরণ ও তাঁদের মানদণ্ডে টিকে থাকা ব্যতীত তারা তাদের জন্য ভাল কিছু অর্জন করবে না। সুতরাং পূর্ববর্তীদের ফিকহের বাইরে যদি তারা কোনো ফিকহের উদ্ভাবন ঘটায় তা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে, যদি না তা এমন বিষয় হয়, যার বর্ণনা তাঁদের (পূর্ববর্তীদের) সময়কার কর্ম ও কথায় সংঘটিত হয়নি এবং এমন বিষয় হয়, যার বিধি-বিধান জানার ক্ষেত্রে

তাঁদের নিয়ম-কানুন ও তাঁদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রমাণের আলোকে তা সংঘটিত হয়। সুতরাং যখন তা তাঁদের মূলনীতিমালার আলোকে হবে, তখন তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে, নচেৎ গ্রহণ করা হবে না; কারণ, তাঁদের পরে যাদের আগমন ঘটেছে, তাদের প্রত্যেকেই বিদ'আতের ব্যাপারে বলে যে, তা মুস্তাহাব, অতঃপর সে (বিদ'আতকে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করার জন্য) এ বিষয়ে তাঁদের মূলনীতিমালার বাইরে দলিল নিয়ে আসে; সুতরাং এটা তার পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, শুধু ভাল ধারণার কারণে কেবল ঐ ব্যক্তিরই অনুসরণ ও অনুকরণ অন্যের জন্য জায়েয হবে, যিনি ন্যায়পরায়ণ মুজতাহিদ (গবেষক) হবেন। কোনো মুকাল্লিদ তথা অনুসরণকারীর অনুসরণ বৈধ হবে না।

কিন্তু যখন দীর্ঘসময় ধরে ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে আছে, তখন কোনো মুজতাহিদের মাযহাব বা মত জানার জন্য কেবল আলেমদের মাঝে প্রচলিত গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ সংকলনের সাহায্য নেওয়াতেই সীমাবদ্ধ। তাও ঐ ব্যক্তির জন্য যিনি উক্ত গ্রন্থ থেকে মুজতাহিদের মত বের করতে সক্ষম। কিন্তু যিনি গ্রন্থ থেকে মাযহাবের মত বের করতে সক্ষম নন, তার জন্য সে মুজতাহিদের মত জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে জ্ঞান ও আমলের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির সংবাদ। সুতরাং গ্রন্থ পেলেই তার উপর আমল শুরু করে দেওয়া বৈধ হবে না; কারণ, এ যুগে এমন বহু গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে, যা দুর্বল ব্যক্তিগণ প্রকৃত অবস্থা না জেনেই সংকলন করেছে, তেমনিভাবে প্রত্যেক আলেমের কথায়ও আমল করা বৈধ হবে না, যেহেতু তিন যুগের পরে মানুষের মধ্যে

পাপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, আর অপরিচিত বা অজ্ঞাত ব্যক্তি ফাসিকের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত[৫০]। সুতরাং দ্বীনের (মুজতাহিদের) সত্যিকার মত জানার ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই প্রাধান্যপ্রাপ্ত ন্যায়পরায়ণতার দিকটি থাকতে হবে।

তারপর এখানে একটি স্বীকৃত নিয়ম রয়েছে, যা জানা খুবই জরুরি; আর তা হল, ফিকহ সংক্রান্ত মাসআলা যখন বর্ণনা করা হবে, তখন উচিত হবে তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া;

- অতঃপর যদি দেখা যায় যে, তার উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র মত সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ, তাহলে সেটা মানার ব্যাপারে কারও পক্ষ থেকে কোনো বিতর্ক নেই।
- কিন্তু যদি তার উৎসস্থল সুবিদিত না হয়, বরং তা ইজতিহাদী (গবেষণাগত) বিষয় হয়,
    - তাহলে বর্ণনাকারী মুজতাহিদ (গবেষক) হলে, মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী) ব্যক্তির উপর তাকে অনুসরণ করা অপরিহার্য হবে এবং তার নিকট দলিল চাওয়াটা তার উপর আবশ্যক হবে না; কারণ, মুজতাহিদের কথাই তার জন্য দলিল;
    - আর বর্ণনাকারী যদি মুজতাহিদ না হয় বরং মুকাল্লিদ হয়,

---

[৫০] আর এটা স্বীকৃত শর'য়ী নিয়েমের পরিপন্থী; কারণ, মুসলিমের ক্ষেত্রে মূলনীতি বা মূলকথা হল সত্যবাদিতা, তবে যখন তারা মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেয়ে যাবে, তখন তার ন্যায়পরায়ণতার দিকটির পতন হয়ে যাবে।

১- তাহলে সে যদি মুজতাহিদ থেকে বর্ণনা করে এবং তার থেকে তার বর্ণনা করাটা যদি প্রমাণিত হয়, তবে এই ক্ষেত্রেও অনুসরণ করাটা অপরিহার্য হবে;

২- কিন্তু সে যদি মুজতাহিদ থেকে বর্ণনা না করে বরং তার নিজের পক্ষ থেকে বর্ণনা করে অথবা অপর কোন মুকাল্লিদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করে অথবা সে সাধারণভাবে বর্ণনা করে,

ক. তখন সে যদি এই ক্ষেত্রে শরী'য়ত সম্মত দলিল বর্ণনা করে, তাহলে তখন তার ব্যাপারে কোন কথা থাকবে না;

খ. আর যদি তা বর্ণনা করা না হয়, তবে সে বিষয়টি লক্ষ্য করতে হবে,

এক. যদি তার কথা মূলনীতি ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং তাতে কোনো প্রকার বিরোধ না থাকে, তাহলে তার উপর আমল করা জায়েয (বৈধ) হবে; কিন্তু তার উপর আমলকারী ব্যক্তির জন্য উচিত হবে, অন্ধ অনুসরণ করার জায়গায় অবস্থান না করে বরং তার নিকট বর্ণনার পক্ষে দলিল দাবি করা।

দুই. আর যদি তার কথা মূলনীতি ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থসমূহের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তাহলে সে দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া যাবে না; কেননা, আলেমগণ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, "যতক্ষণ

পর্যন্ত কোনো বিষয়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানা যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার অনুসরণ করা শুদ্ধ হবে না, যদিও তার কাছে বিষয়টি বাতিল হওয়া জানা না যায়”। তাহলে যেটার বাতিল হওয়ার বিষয়টি জানা যাবে সেটার অনুসরণ করা তো কোনোক্রমেই বিশুদ্ধ হবে না।

***

তৃতীয় আসর

মূলগ্রন্থে তা সাতান্নতম আসর

কবর যিয়ারতের বৈধতা ও অবৈধতা প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا » . (أخرجه مسلم) .

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, সুতরাং তোমরা তা যিয়ারত কর।”[৫১] এই হাদিসটি ‘মাসাবীহ’ (المصابيح) গ্রন্থের বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেছেন; তাতে ইসলামের প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকার বিষয়টির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, কারণ এ কবরগুলোই ছিল মূর্তিপূজার উৎপত্তিস্থল বা

---

[৫১] মুসলিম (২/৬৭২), জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর প্রভু নিকট মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা প্রসঙ্গে (باب اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ); আহমদ (৩/৩৫০); নাসায়ী (৪/৮৯), জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: কবর যিয়ারত প্রসঙ্গে (باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ); হাদিসটি সুলাইমান ইবন বুরাইদা’র সূত্রে তার পিতা থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত।

সূচনা; আর এই কঠিন ব্যাধির সূচনা হয়েছিল নবী নূহ আ. এর জাতির মধ্যে; যেমন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন:

﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥٓ إِلَّا خَسَارًا ۝٢١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ۝٢٢ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝٢٣ ﴾ [نوح: ٢١، ٢٣]

“নূহ্ বলেছিলেন, ‘হে আমার রব! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি; আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে এবং বলেছে, ‘তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্, সুওয়া‘আ, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ও নাসরকে।”[৫২] আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. ও অন্যান্য সালাফে সালেহীন তথা সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ বলেন: “আয়াতে উল্লেখিত ঐসব ব্যক্তিবর্গ ছিলেন নবী নূহ আ. -এর জাতির মধ্যকার সৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত; যখন তাঁরা মারা গেলেন, তখন জনগণ তাঁদের সমাধিস্থলে অবস্থান করতে লাগল, অতঃপর তারা তাঁদের প্রতিমূর্তি বানাল, অতঃপর তাদের এই অবস্থার উপর

---

[৫২] সূরা নূহ, আয়াত: ২১ - ২৩

দিয়ে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তারা তাঁদের উপাসনা করা শুরু করল।”[৫৩]

[কবর যিয়ারতের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, অতঃপর অনুমতি প্রদান]

সুতরাং যেহেতু সাব্যস্ত হলো যে, মূর্তিপূজার উৎপত্তি হয়েছিল কবর থেকে, সেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্কের পথ বন্ধ করার জন্য তাঁর সাহাবীদেরকে ইসলামের প্রথম দিকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন নওমুসলিম বা কুফরী যুগের কাছাকাছি সময়ের মানুষ; তারপর যখন তাঁদের হৃদয়ে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন তিনি তাঁদেরকে পুনরায় কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন এবং তাঁদেরকে কবর যিয়ারতের পদ্ধতি শিক্ষা দেন, কখনও তাঁর কর্মের মাধ্যমে, আবার কখনও তাঁর কথার মাধ্যমে; আর এই বিষয়টি অনকেগুলো হাদিসের মধ্যে রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক হাদিস এসেছে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে, আর কিছু সংখ্যক হাদিস এসেছে (কবর যিয়ারত) পদ্ধতি শিক্ষা দান প্রসঙ্গে; আর তার অভ্যন্তরে স্থান পেয়েছে ফায়দা বা উপকারিতার বর্ণনা।

---

[৫৩] বুখারী (৮/৫৩৫), হাদিস নং- ৪৯২০, তাফসীর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: (ওয়াদ্, সুওয়া‘আ, ইয়াগূছ ও ইয়া‘ঊক) প্রসঙ্গে (باب " وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ "), হাদিসটি ‘আতা র. সূত্রে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত।

কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে যেসব হাদিস এসেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে,

১- আবূ সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً » (أخرجه الطبراني).

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, সুতরাং তোমরা তা যিয়ারত কর; কারণ, তাতে শিক্ষা বা উপদেশ রয়েছে।”[৫৪]

২- অনুরূপভাবে আলী ইবন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّها تذكركم بالآخرة » (أخرجه أحمد).

---

[৫৪] তাবারানী, আল-কাবীর (২৩/২৭৮), হাদিস নং- ৬০২, তিনি ইবনু আবি মালিকা’র সূত্রে উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে মারফু‘ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; হাইসামী তার মাজমা‘উয যাওয়ায়িদ–এর মধ্যে তার লেখক বলেন, এর সনদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবন মুতাওয়াক্কেল নামে এক বর্ণনাকারী আছেন, যিনি দুর্বল।

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, সুতরাং তোমরা তা যিয়ারত কর; কারণ, তা তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।”[৫৫]

৩- আর এই প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّها تزهد في الدنيا» (أخرجه ابن ماجه).

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, সুতরাং তোমরা তা যিয়ারত কর; কারণ, তা দুনিয়ার মোহ ত্যাগে অনুপ্রাণিত করবে।”[৫৬]

---

[৫৫] আহমদ (১/১৪৫), তিনি রবী‘য়া ইবন নাবেগা থেকে, তিনি তার পিতা নাবেগা থেকে এবং তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে মারফু‘ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাইসামী তার মাজমা‘উয যাওয়ায়িদ–এর মধ্যে (৩/৫৮) তার লেখক বলেন, আমি বললাম: ‘আস-সহীহ’ –এর মধ্যে তার কয়েকটি সনদ রয়েছে, যা আবূ ইয়া‘লা ও আহমদ র. বর্ণনা করেছেন, আর তাতে রবী‘য়া ইবন নাবেগা র. আছেন। বুখারী র. বলেন: কুরবানীর অধ্যায়ে আলী থেকে বর্ণিত হাদিস সহীহ নয়।

[৫৬] ইবনু মাজাহ (১/৫০১), হাদিস নং- ১৫৭১, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: কবর যিয়ারত সম্পর্কে যেসব বর্ণনা এসেছে (باب ما جاء في زِيَارَةِ الْقُبُورِ), হাদিসটি মাসরুকের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘

৪- অনুরূপভাবে এ প্রসঙ্গে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« زُورُوا الْقُبُور فَإِنَّها تذكركم الموت » . (أخرجه ابن ماجه) .

“তোমরা কবর যিয়ারত কর; কেননা তা মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।”[৫৭]

৫- তদ্রূপ এ প্রসঙ্গে বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا » . (أخرجه النسائي) .

সনদে বর্ণিত। আর বূসীরী তার ‘মিসবাহুয যুজাজাহ ফী যাওয়ায়িদে ইবন মাজাহ’ গ্রন্থে এই হাদিসের সনদটিকে হাসান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৫৭] ইবনু মাজাহ (১/৫০০), হাদিস নং- ১৫৬৯, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: কবর যিয়ারত সম্পর্কে যেসব বর্ণনা এসেছে (باب ما جاء في زِيَارَةِ الْقُبُورِ), হাদিসটি আবূ হাযেমের সূত্রে আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত, তার শব্দগুলো হল: « زُورُوا الْقُبُور فَإِنَّها تذكركم الآخرة ». [তোমরা কবর যিয়ারত কর; কেননা তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়]; আর আলবানী ‘সহীহ আল-জামে‘ আস-সাগীর’ (صحيح الجامع الصغير) -এর মধ্যে (১/৬৬৮) হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদিস নং- ৩৫৭৭

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, সুতরাং যে ব্যক্তি (বর্তমানে) কবর যিয়ারত করতে চায়, সে যেন যিয়ারত করে এবং তোমরা বাজে-অশ্লিল কথা বলবে না।”[৫৮]

[কবরস্থানে প্রবেশের দো‘আ]

আর যেসব হাদিস কবর যিয়ারতের নিয়ম শিক্ষা দান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,

১- বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

« كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أن يَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بكم لاَحِقُونَ أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. » . (أخرجه مسلم و النسائي و ابن ماجه و أحمد).

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তারা যখন সমাধিস্থলের দিকে বের হবে, তখন তারা যেন বলে:

---

[৫৮] নাসায়ী র. (৪/৮৯) জানাযা অধ্যায়ের ‘কবর যিয়ারতের পরিচ্ছেদে (باب زِيَارَةِ الْقُبُورِ) মারফু‘ সনদে (ইবনু বুরাইদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে) হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন। আর আলবানী ‘সহীহ আল-জামে‘’ (صحيح الجامع) –এর মধ্যে (১/৪৮৫) হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদিস নং- ২৪৭৪

«السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بكم لاَحِقُونَ أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع نسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»

(তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক হে কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব; তোমরা আমাদের অগ্রগামী, আর আমরা তোমাদের অনুগামী; আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি)।”[৫৯]

২- অনুরূপভাবে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকেও বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নের ভাষায় বলেন:

---

[৫৯] মুসলিম (২/৬৭১), হাদিস নং- ৯৭৫, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সমাধিস্থলে প্রবেশ করার সময় যা বলা হয় এবং কবরবাসীর জন্য প্রার্থনা প্রসঙ্গে (باب ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لأهلها); নাসায়ী (৪/৯৪), জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: মুমিনগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রসঙ্গে (باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين); ইবনু মাজাহ (১/৪৯৪), হাদিস নং- ১৫৪৭, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সমাধিস্থলে প্রবেশ করার সময় যা বলা হয়, সে প্রসঙ্গে (باب ما يقال إذا دخل المقابر); আহমদ (৫/৩৫৩, ৩৫৯); ইবনুস সুন্নী, “আমালুল ইয়াউমে ওয়াল লাইলা’ (عمل اليوم و الليلة) [দিনের ও রাতের আমল], পৃ. ১৯৭, হাদিস নং- ৫৯৪, হাদিসটি সুলাইমান ইবন বুরাইদা’র সূত্রে তার পিতা থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত।

« كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي زيارة القبور؟ قَالَ: « قُولِى السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا و منكم وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ» . (أخرجه مسلم و النسائي).

“হে আল্লাহর রাসূল! কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে আমি তাদের উদ্দেশ্য কী বলব? জবাবে তিনি বললেন: তুমি বল:

« السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا و منكم وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ»

(কবরবাসী মুমিন ও মুসলিমগণের প্রতি সালাম; আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মধ্য থেকে অগ্রগামী ও পশ্চাতগামী সকলের প্রতি দয়া করুন; আমরাও আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হব)।”[৬০]

---

[৬০] মুসলিম (২/৬৭০), হাদিস নং- ৯৭৪, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সমাধিস্থলে প্রবেশ করার সময় যা বলা হয় এবং কবরবাসীর জন্য প্রার্থনা প্রসঙ্গে (باب ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لأهلها); নাসায়ী (৪/৯১), জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: মুমিনগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ প্রসঙ্গে (باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين); হাদিসটি মুহাম্মদ ইবন কায়েসের সূত্রে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত।

৩- তদ্রুপ আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানের উদ্দেশ্যে বের হলেন, অতঃপর তিনি বললেন:

«السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا». (أخرجه مسلم).

“তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক; এটা মুমিনদের ঘর; ইনশা আল্লাহ আমরাও এসে তোমাদের সাথে মিলব; আমার বড় ইচ্ছা হয়, আমরা আমাদের ভাইদেরকে দেখি।”[৬১]

৪- আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কবরসমূহের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, অতঃপর তিনি কবরবাসীর নিকট গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন:

---

[৬১] মুসলিম (১/২১৮), হাদিস নং- ২৪৯, পবিত্রতা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: অযূতে মুখমণ্ডলের নূর এবং হাত-পায়ের দীপ্তি বাড়িয়ে নেয়া মুস্তাহাব (باب اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ); নাসায়ী (১/৯৪), পবিত্রতা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: অযূর সৌন্দর্য প্রসঙ্গে (باب حلية الوضوء); আহমদ (২/৩৭৫); মালেক, মুয়াত্তা (১/২৮); হাদিসটি আল-‘আলা ইবন আবদির রহমানের সূত্রে তার পিতা থেকে মারফূ‘ সনদে আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত।

« السلام عليكم يا أهل القبور ! يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر». (أخرجه الترمذي) .

“হে কবরবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক; আল্লাহ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন; তোমরা আমাদের অগ্রগামী, আর আমরাও তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।”[৬২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব হাদিসে কবর যিয়ারতের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন; আর তা হল কবর যিয়ারতকারী ব্যক্তি কর্তৃক নিজের প্রতি ও কবরবাসীদের প্রতি ইহসান করা; আর তার নিজের প্রতি ইহসান মানে হল, মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণ করা, দুনিয়া বিমূখ হওয়া এবং উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা; আর কবরবাসীদের প্রতি তার ইহসান করার মানে হল, তাদের প্রতি সালাম দেওয়া, তাদের জন্য রহমত ও ক্ষমার আবেদন করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা। সকল আলেম বলেন: যিয়ারতের এই বিষয়টি পূরুষ ব্যক্তিদের বেলায় প্রযোজ্য।

---

[৬২] তিরমিযী (৩/৩৬৯), হাদিস নং- ১০৫৩, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ব্যক্তি যখন সমাধিস্থলে প্রবেশ করবে, তখন যা বলবে, সেই প্রসঙ্গে (باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر); আর তিনি বলেছেন, হাদিসটি হাসান, গরীব। তাবারানী, আল-কাবীর (১২/১০৭), হাদিস নং- ১২৬১৩, হাদিসটি কাবুস ইবন আবি যাবইয়ানের সূত্রে তার পিতা থেকে মারফু‘ সনদে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত।

[নারীগণ কর্তৃক কবর যিয়ারত করার বিধান]

আর নারীদের জন্য সমাধিস্থলের উদ্দেশ্যে বের হওয়া বৈধ নয়; কেননা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বললেন:

« لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم زوارات القبور ». (أخرجه ابن ماجه) .

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারিনী নারীদের প্রতি লানত করেছেন।”[৬৩] আর ‘নিসাবুল ইহতিসাব’ (نصاب الاحتساب) নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নারী কর্তৃক সমাধিস্থলের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার বৈধতা সম্পর্কে বিচারককে

---

[৬৩] ইবনু মাজাহ (১/৫০২), হাদিস নং- ১৫৭৪, যা হাসসান ইবন সাবেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, হাদিস নং- ১৫৭৫, যা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, হাদিস নং- ১৫৭৬, যা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: নারীগণ কর্তৃক কবর যিয়ারত করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে (باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور); তিরমিযী (৩/৩৭১), হাদিস নং- ১০৫৬, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: নারীদের জন্য কবর যিয়ারত করা অপছন্দ বা নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গে (باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء); হাদিসটি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত; আলবানী ‘সহীহ আল-জামে’’ (صحيح الجامع) –এর মধ্যে (২/৯০৯) হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদিস নং- ৫১০৯

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: এ ধরনের কাজের বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না, বরং সে কী পরিমাণ লা'নতের (অভিশাপের) উপযুক্ত হবে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর; কারণ, সে যখন সমাধিস্থলের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নিয়ত করে, তখন সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাদের লা'নতের উপযুক্ত হয়ে যায়; আর যখন বের হবে, তখন শয়তান তার সাথে শামিল হয়; আর যখন সমাধিস্থলে উপস্থিত হয়, তখন মৃত ব্যক্তির আত্মা তাকে অভিশাপ দেয়; আর যখন সে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর ফেরেশতাদের লা'নতের মধ্যে থাকে যতক্ষণ না সে তার গৃহের মধ্যে ফিরে আসে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে,

« أيما امرأة خرجت إلى مقبرة يلعنها ملائكة السموات السبع و الأرضين السبع و أيما امرأة دعت للميت بخير و لم تخرج من بيتها يعطيها الله ثواب حجة و عمرة ».

"যে কোন নারী সমাধিস্থলের উদ্দেশ্যে বের হয়, তাকে সাত আসমান ও সাত যমীনের ফিরিশতাগণ লা'নত করতে থাকে; আর যে নারী মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দো'আ করে এমতাবস্থায় যে, সে তার

ঘর থেকে বের হয় না, তাকে আল্লাহ তা'আলা হাজ্জ ও ওমরার সাওয়াব দান করবেন।"[৬৪]

আর সালমান ও আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একদিন মসজিদ থেকে বের হলেন, অতঃপর তিনি তাঁর বাড়ির দরজায় দাঁড়ালেন, অতঃপর তাঁর কন্যা ফাতিমা রা. আসলেন, তারপর তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

« من أين جئت ؟ فقالت: خرجت إلى منزل فلانة التي ماتت . فقال: هل ذهبت إلى قبرها ؟ فقالت: معاذ الله أن أفعل شيئا بعدما سمعت منك ما سمعت . فقال: لو ذهبت إلى قبرها لم ترحي رائحة الجنة » .

"তুমি কোথা থেকে এসেছ? জবাবে তিনি বলেন: আমি অমুকের বাসায় গিয়েছি, যে মারা গিয়েছে; অতঃপর তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি তার সমাধিস্থল পর্যন্ত গিয়েছ? জবাবে তিনি বলেন: আমি আপনার নিকট থেকে যা শুনার, তা শুনার পরেও এমন কিছু করা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই (না'উযুবিল্লাহ); তখন

---

[৬৪] তার ব্যাপারে আমার জানা নেই এবং আমি এটাকে হাদিস মনে করি না; তবে তার অর্থে একটি হাদিস রয়েছে:

« لعن الله زوارات القبور ». (আল্লাহ তা'আলা কবর যিয়ারতকারিনী নারীদের প্রতি লানত করেছেন)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি যদি তার সমাধিস্থল পর্যন্ত যেতে, তাহলে জান্নাতের ঘ্রাণও পেতে না।”[৬৫]

[কবরবাসীদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ]

সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, পুরুষ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি, যে কবর যিয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তার যিয়ারতের অংশটুকু যাতে চতুষ্পদ যন্তুর প্রদক্ষিণের মত না হয়, বরং সে যখন কবরের নিকট আসবে, তখন তার জন্য উচিত কাজ হল কবরবাসীদের উপর সালাম পেশ করা এবং তাদেরকে উপস্থিত ব্যক্তিদের মত করে সম্বোধন করা; আর তাদের জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, যেমনটি পূর্বে উল্লেখিত হাদিসসমূহের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর যিয়ারতকারী ব্যক্তি যারা মাটির নীচে চলে গেছে এবং পরিবার-পরিজন ও প্রিয় ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে; আর মৃত ব্যক্তি

---

[৬৫] আবূ দাউদ (৩/৪৬০), হাদিস নং- ৩১২৩, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: শোকপ্রকাশ প্রসঙ্গে (باب التعزية); নাসায়ী (৪/২৭), জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: ক্রন্দন করা প্রসঙ্গে (باب النعي), হাদিসটি আবূ আবদির রহমান আল-হুবুল্লী’র সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর রা. থেকে মারফু‘ সনদে লম্বা কাহিনী আকারে বর্ণিত। ইমাম নাসায়ী র. বলেন: বর্ণনাকারী রবী‘আ দুর্বল, সে আবূ আবদির রহমান আল-হুবুল্লী থেকে বর্ণনা করেছে; হাকেম (১/৩৭৪), তিনি বলেন: হাদিসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. –এর শর্তের আলোকে বিশুদ্ধ, আর ইমাম যাহাবী র. অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

যখন কবরে প্রবেশ করেছে, তখন প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে: সে কি সঠিকভাবে সেগুলোর জবাব দিতে পেরেছে এবং তার কবর কি জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগানে পরিণত হয়েছে? নাকি সে জবাব দানে ভুল করেছে? আর তার কবর পরিণত হয়েছে জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি গর্তে পরিণত হয়েছে!! অতঃপর সে নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করবে যে, সে যেন মারা গেছে, কবরে প্রবেশ করেছে এবং তার নিকট থেকে দূরে সরে গেছে তার সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও তার পরিচিত লোকজন; আর সে একাই অবশিষ্ট রয়ে গেছে; এখন সে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, সুতরাং সে কী জবাব দেবে? তার অবস্থা কী হবে? আর সে কবরস্থানে যতক্ষণ অবস্থান করে, ততক্ষণ এ ধরনের শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং এই ধরনের ভয়ঙ্কর বিষয়সমূহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার মাওলার (আল্লাহ তা‘আলা’র) সাথে সম্পর্ক রাখবে এবং তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করবে।

[কবরের নিকট কুরআন পাঠ করার বিধান]

কবরস্থানে কুরআন পাঠ করাকে আলেমদের এক অংশ বৈধ বলেছেন; তবে অধিকাংশ আলেম তা করতে নিষেধ করেছেন। তারা বলেন: যিয়ারতকারীর জন্য আবশ্যক হলো শিক্ষা গ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত থাকা; আর কুরআন পাঠ করার দ্বারা পাঠক পঠিত অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন অনুভব

করে; আর শিক্ষা গ্রহণ ও চিন্তাভাবনা একই সময়ে একই মনে একত্রিত হতে পারে না।

[কবরস্থানে কুরআন পাঠ বিষয়ে একটি সংশয় ও তার উত্তর]

যদি কেউ বলে যে, আমি এক সময় শিক্ষা গ্রহণ করব আর অন্য সময় কুরআন পাঠ করব; আর যখন কুরআন পাঠ করা হবে, তখন রহমত নাযিল হয়, সুতরাং আশা করা যায় যে, ঐ রহমত থেকে কবরবাসীদের সাথে কিছু রহমত সম্পৃক্ত হবে, যা তাদেরকে উপকৃত করবে।' তাহলে এর কয়েকটি জবাব হতে পারে:

প্রথমত: কুরআন পাঠ করা যদিও ইবাদত, কিন্তু যিয়ারতকারীর জন্য মৃত্যু, ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন ও অন্যান্য বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও শিক্ষা গ্রহণ নিয়ে ব্যস্ত থাকাও এক প্রকারের ইবাদত, যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে; আর সময়টি শুধু এই ইবাদতের জন্যই উপযুক্ত ক্ষেত্র, সুতরাং সে এক ইবাদত থেকে অন্য ইবাদতে যাবে না, বিশেষ করে (নিজের জন্য ইবাদত বাদ দিয়ে) অন্যের (উপকারের) জন্য নয়।

দ্বিতীয়ত: সে যদি তার ঘরের মধ্যে কুরআন পাঠ করে এবং তার সাওয়াব তাদের প্রতি হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে এইভাবে যে, সে তিলাওয়াত থেকে অবসর নেয়ার পর তার ভাষায় বলবে: হে আল্লাহ! আমার তিলাওয়াতের সাওয়াব কবরবাসীদের জন্য কবুল করে নাও,

তাহলে তা তাদের নিকট পৌঁছে যাবে[66]। নিশ্চয়ই এটি দো'আ যা তাদের নিকট সাওয়াবকে পৌঁছিয়ে দেবে; আর দো'আ সর্বসম্মতিক্রমে পৌঁছে যায়; সুতরাং তাদের কবরের পাশে গিয়ে কুরআন পাঠের প্রয়োজন নেই।

তৃতীয়ত: তাদের কবরের নিকট তার কুরআন পাঠ করাটা তাদের কারও কারও আযাবের (শাস্তির) কারণ হতে পারে, কেননা যখনই এমন আয়াত অতিক্রম করবে, যা সে আমল করেনি, তখনই তাকে বলা হবে: তুমি কি তা পাঠ করনি?! তুমি কি তা শ্রবণ করনি, তাহলে কিভাবে তার বিপরীত কাজ করলে এবং তার উপর আমল করলে না? ফলে তার (আয়তের) প্রতি তার বিরুদ্ধাচরণের কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

চতুর্থত: তার (কুরআন পাঠের) সমর্থনে কোনো সুন্নাহ বা হাদিস বর্ণিত হয়নি; আর তা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। সুতরাং ব্যাপারটি যখন এ রকম, তখন যিয়ারতকারীদের জন্য উপযুক্ত কাজ হল, সুন্নাহ'র অনুসরণ করা এবং তাদের জন্য শরী'আত যা অনুমোদন দিয়েছে, সেখানেই থেমে যাওয়া ও তার সীমা লঙ্ঘন না

---

[66] এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সতনিষ্ঠ আলেমদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। অনেকেই এ ধরনের ঈসালে সাওয়াবকে শরী'আতসম্মত মনে করেন না। তাই উচিত হবে কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি নেক আমলের পর সেটার উসিলা দিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা, সেটা পাঠিয়ে দেওয়া নয়। [সম্পাদক]

করা; যাতে তারা তাদের নিজেদের প্রতি এবং কবরবাসীদের প্রতি ইহসানকারী হতে পারে; কারণ-

[কবর যিয়ারত দুই প্রকার: শরী‘আতসম্মত ও বিদ‘আত]

কবর যিয়ারত দু’ প্রকার: শরী‘য়তসম্মত যিয়ারত এবং বিদ‘আত পন্থায় যিয়ারত। তন্মধ্যে **শরী‘আত পন্থায় যিয়ারত হল**, যে যিয়ারতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি প্রদান করেছেন; আর তার উদ্দেশ্য হল দু’টি: তন্মধ্যে একটি যিয়ারতকারীর সাথে সম্পর্কিত, আর তা হল, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করা। আর দ্বিতীয়টি কবরবাসীদের সাথে সম্পর্কিত, আর তা হল, যিয়ারতকারী কর্তৃক তাদের প্রতি সালাম পেশ করা এবং তাদের জন্য দো‘আ করা।

আর **বিদ‘আত পন্থায় যিয়ারত হল,** কবরের নিকট সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা; আর তাকে প্রদক্ষিণ করা, চুম্বন করা, স্পর্শ করা, কবরের মাটি গাল ঘষা, তার মাটি গ্রহণ করা, কবরবাসীকে ডাকা, তাদের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা; তাদের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা, রিযিক, ক্ষমা, সন্তান, ঋণ পরিশোধ কামনা করা, দুঃখ-কষ্ট লাঘব আশা করা, দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়ার আশা করা ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োজন পূরণের জন্য সাহায্য চাওয়া, যা মূর্তিপূজারীরা তাদের মূর্তিদের নিকট চেয়ে থাকে। বস্তুত বিদ‘আতী, শির্কী এ যিয়ারতের ধারণা মূর্তিপূজারীদের নিকট থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে; মুসলিম আলেমদের সর্বসম্মত মতে এসবের কোনো কিছুই

শরী‘য়ত সম্মত নয়; কেননা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা, তাবে‘য়ীন ও দীনের সকল ইমামগণের মধ্য থেকে কেউ এ ধরনের কাজ করেননি।

[শির্কের উপলক্ষসমূহ থেকে সাহাবীগণের বেঁচে থাকা]

বরং সাহাবীগণ এর চেয়ে আরও অনেক তুচ্ছ বিষয়েরও জোর প্রতিবাদ করেছেন; যেমন, মা‘রুর ইবন সুয়াইদ থেকে বর্ণিত, ওমর রা. একদিন মক্কার রাস্তার মধ্যে ফজরের সালাত আদায় করেছেন, অতঃপর দেখলেন জনগণ কোনো এক জায়গায় যাচ্ছে; অতঃপর তিনি বললেন: এসব লোক কোথায় যাচ্ছে? তখন তাকে বলা হল: তারা এমন এক মসজিদে যাচ্ছে, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায় করেছেন, সুতরাং তারও তাতে সালাত আদায় করবে; অতঃপর তিনি বললেন: তোমাদের পূর্ববর্তীগণ শুধু এ ধরনের আচরণের কারণেই ধ্বংস হয়েছে, তারা তাদের নবীদের নিদর্শনসমূহের অনুসরণ ও অনুকরণ করত এবং সেগুলোকে মন্দির ও গির্জার মত উপাসনালয় বলে গ্রহণ করত; এসব মসজিদের মধ্যে যাকে সালাতের সময় পেয়ে যাবে, সে যেন তাতে সালাত আদায় করে নেয়; আর যাকে ঐসব মসজিদের মধ্যে সালাতের সময় পায়নি,

সে যেন স্বাভাবিক অবস্থা অব্যাহত রাখে এবং ঐসব স্থানে সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে সেখানে না যায়।[৬৭]

অনুরূপভাবে যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, লোকজন ঐ গাছটিকে (বরকত হিসেবে) গ্রহণ করছে, যার নীচে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণ থেকে বাই'আত (শপথ) গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি ঐ গাছের নিকট লোক পাঠালেন, অতঃপর তা কেটে ফেলা হয়।[৬৮] যে গাছটির নীচে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন এবং যার আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে বলেন:

﴿ لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ ... ﴾ [الفتح: ١٨]

---

[৬৭] আবদুর রাযযাক, আল-মুসান্নাফ (২/১১৮, ১১৯), হাদিস নং- ২৭৩৪, হাদিসটি আ'মাশের সূত্রে মা'রুর ইবন সুয়াইদ থেকে বর্ণিত, যে বর্ণনাটির সনদ ওমর রা. এর সাথে সম্পর্কিত; আরও দেখুন: আল-ফাতহ (১/৬৭৮)।

[৬৮] ঘটনাটি ইবনু সা'দ তার 'আত-তাবাকাত' (الطبقات) –এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন, ২/১০০; হাফেজ ইবনু হাজার 'আসকালানী র. (৭/৪৪৮) সনদটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন; আর ইমাম মুহাম্মদ ইবন ওয়াদ্দাহ 'আল-বিদা'উ' ওয়ান নাহইয়ু 'আনহা' (البدع و النهي عنها) নামক গ্রন্থের মধ্যে তা বর্ণনা করেছেন: ৪২ – ৪৩; ইবনু আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ: ২/৩৭৫

“(অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বাই‘আত গ্রহণ করেছিল, ... ।)” [৬৯] যখন ওমর রা. উক্ত গাছটির সাথে এ আচরণ করেছিলেন, তখন অন্যান্য কিছু (যেখানে এ ধরনের অবৈধ যিয়ারত সংঘটিত হয়) তার বিধান কেমন হতে পারে?!

আর সালফে সালেহীন তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে নির্ভেজাল করেছেন এবং তার সীমানা সংরক্ষণ করেছেন, তাই ওয়ালিদ ইবন আবদিল মালেকের যামানা পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরাকে মসজিদ থেকে পৃথক রাখা হয়, তখন সাহাবী ও তাবে‘য়ীগণের মধ্য থেকে একজনও তাতে প্রবেশ করত না, না সালাত আদায় করার জন্য, না দো‘আর জন্য, না ইবাদত জাতীয় অন্য কিছুর জন্য, বরং তারা এসব কিছু মসজিদের ভিতরেই করতেন।

[নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট সহাবীগণের সালাম ও দো‘আর ধরন]

তাঁদের কেউ যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম পেশ করতেন এবং দো‘আ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তিনি কিবলামুখী হতেন এবং তাঁর পিঠকে কবরের দেওয়ালের

---

[৬৯] সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৮।

দিকে করতেন, অতঃপর তিনি দো‘আ করতেন; আর এটা এমন পদ্ধতি, যার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন বিতর্ক নেই।

তাদের মাঝে মতবিরোধ তো কেবল রাসূলের উপর সালাম পেশ করার সময়ের অবস্থা নিয়ে। ইমাম আবূ হানিফা র. বলেন: সালাম দেওয়ার সময়ও কিবলামুখী হবে, কবরমুখী হবে না; আর অন্যরা বলেন: দো‘আর সময় কবরমুখী হবে না, বরং তারা বলেন: সে দো‘আর সময় কিবলামুখী হবে, কবরমুখী হবে না; যাতে করে কবরের নিকট কোনো দো‘আ না হয়; কারণ, দো‘আ হচ্ছে ইবাদত, যা মারফু‘ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« إن الدعاء هو العبادة » . (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي و ابن ماجه) .

“নিশ্চয় দো‘আ হচ্ছে ইবাদত।”[৭০]

---

[৭০] আহমদ (২/২৬৭, ২৭, ২৭৬, ২৭৬, ২৭৭); আবূ দাউদ (২/১৬১), সালাত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: দোয়া বা প্রার্থনা (باب الدعاء), হাদিস নং- ১৪৭৯; তিরিমিযী (২১১), হাদিস নং- ২৯৬৯, তাফসীর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সূরা আল-বাকারা (باب و من سورة البقرة), (৫/৩৭৪), হাদিস নং- ৩২৪৭ পরিচ্ছেদ: সূরা আল-মুমিন (৫/৪৫৬), হাদিস নং- ৩৩৭২, দো‘য়া অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: দো‘য়া’র ফযিলত সম্পর্কে যা এসেছে (باب ما جاء في فضل الدعاء), আর তিনি বলেন: হাদিসটি হাসান, সহীহ। ইবনু মাজাহ (২/১২৫৮), হাদিস নং- ৩৮২৮, দো‘য়া অধ্যায়,

আর সালাফে সালেহীন তথা সাহাবী ও তাবে‘য়ীগণ ইবাদতকে নির্ভেজালভাবে আল্লাহ তা‘আলার জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং তারা ইবাদতের মধ্য থেকে কোন কিছুই কবরের নিকটে করেননি; তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন, সেই বিষয়টি ভিন্ন; যেমন, কবরবাসীর উপর সালাম প্রেরণ, আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাদের জন্য রহমত, ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা; আর এর কারণ হল, মৃত ব্যক্তির আমল করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে; আর সে এখন ঐ ব্যক্তির মুখাপেক্ষী যে তার জন্য দো‘আ করবে এবং তার পক্ষে সুপারিশ করবে। আর এ জন্যই শরী‘আত তার সালাতে জানাযায় তার জন্য দো‘আ করাকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব করে দিয়েছে; অথচ জীবিত ব্যক্তির জন্য তেমনটি করেনি; কারণ, আমরা যখন জানাযার উদ্দেশ্যে দাঁড়াই, তখন আমরা তার জন্য দো‘আ করি এবং তার উদ্দেশ্যে সুপারিশ করি।

পরিচ্ছেদ: দো‘য়া’র ফযিলত (باب فضل الدعاء); বুখারী, শিষ্টাচার (আদব) অধ্যায় (পৃ. ১০৫); ইবনু আবি শায়বা, আল-মুসান্নাফ (২/২১), হাদিস নং- ২৯১৬৭, পরিচ্ছেদ: দো‘য়া’র ফযিলত (باب فضل الدعاء); ইবনু হাব্বান (২/১২৪), হাদিস নং- ৮৮৭ (ইহসান); বায়হাকী, আশ-শু‘য়াব [الشعب] (২ /৩৭), হাদিস নং- ১১০৫; হাকেম (১/৪৯১) এবং তিনি বলেছেন, সনদটি সহীহ, আর যাহাবীও এই ধরনের মত পেশ করেছেন; ইবনু জারির, আত-তাফসীর (২৪/৭৮, ৭৯, তাদের সকলেই ইয়াসই‘য়া আল-কিন্দী’র সূত্রে নু‘মান ইবন বাসীর থেকে মারফু‘ সনদে হাদিসখানা বর্ণিত; আলবানী ‘সহীহ আল-জামে‘’ (صحيح الجامع) – এর মধ্যে (১/৬৪১), হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদিস নং- ৩৪০৭

[মৃত ব্যক্তির জন্য দাফনের পরে দো‘আ করা]

সুতরাং দাফনের পরে আমরা আরও উত্তমভাবেই তার জন্য দো‘আ ও সুপারিশ করব; কারণ, দাফনের পর সে তার কবরের মধ্যে কঠিনভাবে দো‘আর প্রয়োজন অনুভব করবে; কেননা সে তখন প্রশ্ন ও অন্যান্য বিষয়ের মুখোমুখী হবে, যা উসমান ইবন ‘আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ ». (أخرجه أبو داود).

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফনকাজ সম্পন্ন করে অবসর হতেন, তখন তিনি তার কবরের পাশে অবস্থান করতেন, অতঃপর বলতেন: ‘তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা কামনা কর; কেননা এখন সে জিজ্ঞাসিত হবে।” [৭১]

[৭১] আবূ দাউদ (৩/৫৫০), জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: স্থান ত্যাগ করার সময় কবরের নিকট মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রসঙ্গে (باب الاِسْتِغْفَارِ عِنْدَ الْقَبْرِ لِلْمَيِّتِ فِي وَقْتِ الاِنْصِرَافِ); হাকেম (১/৩৭০); ইমাম যাহাবী তাকে সহীহ বলেছেন এবং তিনি ওসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’র আযাদকৃত গোলাম হানী’র সূত্রে ওসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর আলবানী ‘সহীহ আল-জামে’’

সুফিয়ান সাওরী র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে: তোমার রব কে? তখন শয়তান তাকে কোনো এক আকৃতি ধারণ করে দেখায় এবং নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, নিশ্চয় আমি তোমার রব।"

ইমাম তিরমিযী র. বলেন: এটা বড় ফিতনা বা পরীক্ষা; এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দৃঢ়ও ও অটল থাকার জন্য দো'আ করে বলতেন: "হে আল্লাহ! প্রশ্ন করার সময় তার কথাকে অটল রাখ এবং তার আত্মার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দাও"। আর মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তারা এ কথা বলতে পছন্দ করতেন: "হে আল্লাহ! তুমি তাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা কর।"

এটা হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত; কবরবাসীদের ব্যাপারে বিশটিরও অধিক সুন্নাত রয়েছে, আর এগুলো খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত এবং সকল সাহাবী ও তাবে'য়ী'র তরিকা বা পদ্ধতি। কিন্তু তারপর বিদ'আতীরা ও পথভ্রষ্টরা তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল, তা পরিবর্তন করে ফেলেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যিয়ারতকে শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন মৃত ব্যক্তি ও যিয়ারতকারী ব্যক্তির প্রতি ইহসান হিসেবে,

---

(صحيح الجامع) –এর মধ্যে (১/২২৪), হাদিসটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন, হাদিস নং-৯৪৫

তারা সেটাকে বদলে দিয়েছে মৃত ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো কিছু চাওয়া ও তার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা দ্বারা। আর এটা ফিতনা ছাড়া অন্য কিছু নয়, যে ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রা. বলেন: “তোমাদের তখন কি অবস্থা হবে? যখন তোমরা এমন ফিতনার শিকার হবে, যাতে বড়রা অতিশয় বৃদ্ধ হবে এবং ছোটরা তাতে বেড়ে উঠবে, আর এ ফিতনা জনগণের উপর এমনভাব চেপে বসবে যে, তারা সে ফিতনায় পরিবর্তিত হওয়ার পরে সেটাকে সুন্নাহ হিসেবে গ্রহণ করবে। আর তারা বলবে, সুন্নাহ পরিবর্তিত হয়ে গেছে।”[৭২]

ইবনুল কায়্যিম তার ‘ইগাসাতুল লাহফান’ (إغاثة اللهفان) নামক গ্রন্থে বলেন: এটা প্রমাণ করে যে, যখন সুন্নাহ বিরোধী নীতির উপর কাজ চলতে থাকে, তখন তা বিবেচনাযোগ্য থাকে না এবং তার প্রতি দৃষ্টিও দেওয়া যায় না। অথচ সুন্নাহ পরিপন্থী কাজ দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে; সুতরাং সে ক্ষেত্রে জরুরি হল শরী‘য়তের মধ্যে নবপ্রবর্তিত (বিদ‘আতপূর্ণ) বিষয়গুলো থেকে কঠিনভাবে বেঁচে থাকা, যদিও অধিকাংশ লোক এ ব্যাপারে একমত হোক না কেন, সুতরাং সাহাবীগণের পরবর্তী সময়ে নবপ্রবর্তিত কোনো বিষয়ে তাদের একমত হওয়ার ব্যাপারটি যেন কোনোভাবেই তোমাকে প্রতারিত না করে, বরং তোমার জন্য উচিত হবে তাদের অবস্থা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানে আগ্রহী হয়ে উঠা; কারণ, সবচেয়ে বিজ্ঞ ও

[৭২] না‘ঈম ইবন হাম্মাদ, আল-ফিতান (১/৪১ – ৪২), হাদিস নং- ৫১

আল্লাহর নিকটতম মানুষ সেই, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সাহাবীগণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তাঁদের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। কারণ, তাঁদের নিকট থেকে দীন গ্রহণ করা হয়েছে, আর শরী'য়ত প্রবর্তকের নিকট থেকে শর'য়ী বিধিবিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরাই হলেন আসল বা মূল শক্তি; সুতরাং তোমার জন্য আবশ্যক হল, তোমার যুগের লোকজনের সাথে তোমার বিরোধপূর্ণ কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ না দেওয়া, যে বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের মানুষের সাথে তোমার মতের সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে; কারণ, হাদিসের মধ্যে এসেছে:

« إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم » .

"যখন মানুষ মতবিরোধ করবে, তখন তোমাদের কর্তব্য হল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক তথা সাহাবায়ে কিরামের মতকে গ্রহণ করা।"[৭৩]

---

[৭৩] ইবনু মাজাহ (২/১৩০৩), হাদিস নং- ৩৯৫০, ফিতনা অধ্যায় (كتاب الفتن), পরিচ্ছেদ: সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের (মতামত) প্রসঙ্গে (باب السواد الأعظم), হাদিসটি আবূ খালফ আল-আ'মা সূত্রে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' সনদে বর্ণিত; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: « إن أمتي لا تجتمع على ضلالة . فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم» (নিশ্চয়ই আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। সুতরাং তোমরা যখন মতবিরোধ লক্ষ্য করবে, তখনতোমাদের কর্তব্য হল সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের মতকে গ্রহণ করা)। 'আয-যাওয়ায়েদ' (الزوائد) নামক গ্রন্থের মধ্যে আছে, এই হাদিসের সনদের মধ্যে

আবূ শামাহ নামে পরিচিত আবদুর রহমান ইবন ইসমাঈল বলেন, “যখন কোনো বিষয় আল-জামা‘আতকে মেনে চলার অপরিহার্যতা দেওয়া হয়, তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হয় সত্য ও তার অনুসরণের আবশ্যকতা; যদিও সত্য অবলম্বনকারীগণ সংখ্যায় কম হউক এবং তার বিরোধীরা সংখ্যায় বেশি হউক! তবে হক্ব তো তা-ই যার উপর প্রথম জামা‘আত বা দল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আরা তাঁরা হলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ। তাঁদের পরবর্তীতে বাতিলের সংখ্যাধিক্যের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বা বিবেচিত হবে না।”

ফুদাইল ইবন ‘আইয়াদ বলেন, যার অর্থ হচ্ছে: “তুমি হিদায়েতের পথে অবস্থান কর, সুন্নাহ’র অনুসারীদের সংখ্যার স্বল্পতা তোমার ক্ষতি করবে না; আর ভ্রষ্টপথ পরিহার কর, ধ্বংসশীলদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রতারিত হবে না।”

ইবনু মাস‘উদ রা. বলেন: “তোমরা এমন যামানায় অবস্থান করছ, যাতে তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে বিবিধ কাজের ক্ষেত্রে দ্রুতগতি সম্পন্ন; অথচ তোমাদের পরে অচিরেই এমন এক সময় আসবে, যাতে তাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি হবে

আবূ খালফ আল-আ‘মা নামে একজন বর্ণনাকারী আছে, যার প্রকৃত নাম হাযেম ইবন ‘আতা, তিনি দূর্বল; আর এই হাদিসটি আরও কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, প্রতিটি সনদেই ত্রুটি রয়েছে, ইরাকী বায়যাভী’র হাদিসসমূহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এমন কথা বলেছেন।

সে-ই, পর্বতপ্রমাণ সন্দেহ-সংশয়ের কারণে কাজের ক্ষেত্রে থমকে দাঁড়াবে।”

ইমাম গাযালী র. বলেন: তিনি (ইবন মাসউদ রা.) সত্য বলেছেন; কারণ, এ যামানায় যে ব্যক্তি (হকের ব্যাপারে) দৃঢ়তা অবলম্বন করবে না, বরং অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে এবং তারা যাতে নিমগ্ন থাকবে সেও তাতে মগ্ন থাকবে, তাহলে সে ধ্বংস হবে, যেমনিভাবে তারা ধ্বংস হয়েছে। কারণ, দীনের মূল, খুঁটি ও ভিত্তি অধিক ইবাদত, তিলাওয়াত ও খেয়ে না খেয়ে চেষ্টাসাধানা করার নাম নয়; বরং দীন হল তার উপর আপতিত বিদ‘আত ও নবপ্রবর্তিত শর‘য়ী বিধানের মত যাবতীয় দুর্যোগ ও ব্যাধি থেকে তাকে সংরক্ষণ করা। যেমনিভাবে এসব কারণে ইতঃপূর্বে পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে নবী-রাসূলদের দীনসমূহে।

এর উপর ভিত্তি করে মুমিনের উচিত হবে, কোনো বিষয়ে তার শক্তিশালী সুদৃঢ় সংকল্প ও এর দ্বারা অধিক ইবাদত করা দ্বারা এ ধোঁকা না খাওয়া যে, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। কারণ, সে ব্যাপারে তার দৃঢ়তা এবং তাকে করাত দিয়ে ছিড়ে ফেললেও তার থেকে তার ফিরে না আসা এটা প্রমাণ করে না যে, সে তার দীনের ব্যাপারে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; কেননা সে ব্যাপারে তার দৃঢ়তা ও শক্ত অবস্থান সেটি সত্য হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং তা হচ্ছে তার এমন এক জাতির মাঝে বেড়ে উঠার কারণে, যারা এটাকে দীন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

বস্তুত কোনো বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প ও শক্ত অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে জন্ম ও মেলামেশার একটা বড় প্রভাব রয়েছে, চাই তা সত্য হউক অথবা বাতিল হউক। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, এই ধরনের দৃঢ়তা ও একগুয়েমী সকল গণ্ড মূর্খ ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায়, যেমন ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও তাদের মত ব্যক্তিদের মধ্যে।

আর যখন এটা (বিদ‘আত নিন্দনীয় হওয়ার বিষয়টি) সুসাব্যস্ত হলো, তখন বর্তমান কালের প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর অপরিহার্য হলো, কোনো প্রকার বিদ‘আতের দিকে ঝুঁকে পড়া ও তা দ্বারা ধোঁকাগ্রস্ত হওয়া থেকে নিজেকে হেফাযত করা এবং তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত অভ্যাস বা প্রথা থেকে রক্ষা করা, যাতে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এবং যার উপর সে বেড়ে উঠেছে। কারণ, তা হচ্ছে প্রাণহারী বিষ; খুব কম লোকই এই ধরনের মহামারী থেকে বাঁচতে পারে এবং খুব কম লোকের কাছেই সেগুলোর সত্য বিষয়টি ফুটে উঠে।

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, কুরাইশগণ তাদের প্রাণের সাথে মিশে যাওয়া স্বভাব-চরিত্র তথা প্রথার কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হিদায়াত ও দলিল-প্রমাণ নিয়ে এসেছেন, তারা তা অস্বীকার করেছিল, আর এটাই ছিল তাদের কুফরী ও সীমালংঘন করার অন্যতম কারণ। এমনকি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যা যা বলেছে তার কারণ তো শুধু এই যে, তারা যেসব প্রথার উপর বেড়ে উঠেছে এবং যেটার উপর তারা বড়

হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত হিদায়াত তার বিপরীতে ছিল। আর এজন্যই আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রা. বলতেন:

«إياكم و ما يحدث من البدع فإن الدين لا يذهب بمرة من القلوب، بل الشيطان يحدث لكم بدعا حتى يذهب الإيمان من قلوبكم » .

“তোমরা নবউদ্ভাবিত বিদ‘আত থেকে বেঁচে থাক; কারণ, নিশ্চয় হৃদয় থেকে দ্বীন একবারে ছিনিয়ে নেওয়া হয় না, বরং শয়তান তোমাদের জন্য বহু ধরনের বিদ‘আতের উদ্ভাবন করবে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তোমাদের অন্তর থেকে ঈমান চলে যাবে”।

আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে সত্যকে সত্য হিসেবে দেখিয়ে দেন এবং আমাদেরকে তার অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন; আবার তিনি যেন আমাদেরকে বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখিয়ে দেন এবং আমাদেরকে তা পরিহার করে চলা নসীব করেন।

* * *

চতুর্থ আসর

মূলগ্রন্থে তা আটান্নতম আসর

মৃত্যুর কথা স্মরণ করা ও তার জন্য প্রস্তুতির অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أكثروا ذكر هادم اللذات الموت » .

“তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী মুত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ কর।”[৭৪] এই হাদিসটি ‘মাসাবীহ’ (المصابيح) গ্রন্থের হাসান হাদিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণনা করেছেন; তার অর্থ হল, মৃত্যু প্রতিটি স্বাদ ও রুচিকে ধ্বংস করে দেয়; সুতরাং তোমরা তার কথা

---

[৭৪] ইবনু হাব্বান (৪/২৮১, ২৮২), হাদিস নং- ২৯৮১, ২৯৮২, ২৯৮৩, ২৯৮৪; জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: মৃত্যুর স্মরণ প্রসঙ্গে (فصل في ذكر الموت); হাদিসটি আবূ সালমা সূত্রে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত। আর অপর এক বর্ণনার মধ্যে "الموت" শব্দটি অতিরিক্ত আছে। আর আলবানী ‘সহীহ আল-জামে‘’ (صحيح الجامع) –এর মধ্যে (২৬৪৮), হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, হাদিস নং- ১২১১ এবং তিনি তার সনদকে ইবনু ওহাব, ইবনু হাব্বান ও আল-বাযারের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

বেশি বেশি স্মরণ কর; যাতে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পার। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: "তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ কর" খুব সংক্ষিপ্ত একটি বাক্য, কিন্তু তিনি তাতে সকল উপদেশকে সন্নিবেশিত করেছেন। কেননা, সত্যিকার অর্থে যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে, তার উপর বর্তমানের স্বাদ-আহ্লাদ ও ভবিষ্যতের আকাঙ্খা শক্তি হ্রাস পায়; আর তা স্বাদ-আহ্লাদের কামনা-বাসনা থেকে তাকে বিমুখ করে দেয়; কিন্তু নিশ্চল প্রাণ ও অলস মন প্রয়োজন অনুভব করে উচ্চ আওয়াজ ও দীর্ঘ উপদেশের; তা না হলে, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ ﴾ [الانبياء: ٣٥]

[প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে][৭৫]

সাথে সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

« أكثروا ذكر هادم اللذات الموت »

(তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী মুত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ কর) এর মধ্যে এমন উপদেশ রয়েছে, যার কথা শ্রবণকারী এবং তা প্রত্যক্ষকারীর জন্য তা-ই যথেষ্ট।

---

[৭৫] সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫

কারণ, মৃত্যুর স্মরণ এই নশ্বর পৃথিবীর প্রতি অনাগ্রহের চেতনাকে জাগ্রত করে এবং প্রতিটি মুহূর্তে স্থায়ী আবাসভূমি পরকালের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে; কেননা, আলেমগণ বলেছেন: মৃত্যু শুধু অস্তিত্বহীন ও বিনাশকারী বস্তুই নয়, বরং তার কাজ হল শরীরের সাথে আত্মার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা এবং একটা থেকে অপরটার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করা; এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় পরিবর্তন করা এবং এক জগৎ থেকে আরেক জগতে স্থানান্তর করা; আর তা বড় আকারের বিপদ-মুসিবতগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম মহামুসিবত, আল্লাহ তা‘আলা তাকে মুসিবত (বিপদ) বলেই নামকরণ করেছেন; তিনি বলেন:

﴿... فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ ﴾ [المائدة: ١٠٦]

“ ... এবং তোমাদেরকে মৃত্যুর বিপদ পেয়ে বসে। ...” [৭৬]

সুতরাং মৃত্যু হচ্ছে মহামুসিবত এবং তার চেয়ে বড় মুসিবত হল তার থেকে অন্যমনস্ক হওয়া, তার স্মরণ না করা ও তার ব্যাপারে চিন্তাভাবনার কমতি করা। নিশ্চয়ই এককভাবে তার মাঝেই শিক্ষা গ্রহণকারীর জন্য শিক্ষা রয়েছে।

ইমাম কুরতবী র. তাঁর ‘আত-তাযকিরা’ নামক গ্রন্থে বলেন: গোটা জাতি এই ব্যাপারে একমত যে, মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স

---

[৭৬] সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ১০৬

নেই এবং নেই কোনো নির্দিষ্ট ব্যাধি, বরং তা এরকমই, ব্যক্তি তার ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্ত থেকেই তার জন্য প্রস্তুত থাকবে; কিন্তু যার উপর দুনিয়ার মোহ বিজয় লাভ করবে এবং যে তার মোহে নিমগ্ন থাকবে, নিশ্চিতরূপেই সে মৃত্যুর স্মরণ থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে এবং সে তাকে স্মরণ করবে না, বরং তার নিকট যখন তার আলোচনা করা হবে, তখন সে তা অপছন্দ করবে এবং স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সেখান থেকে কেটে পড়বে; কারণ, তার হৃদয়ের মধ্যে দুনিয়া প্রেমের প্রবলতা এবং তার সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ তার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় সে ঐ মৃত্যুর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা থেকে বিরত থাকে, যা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র কারণ এবং সে তার স্মরণ করাকে পছন্দ করে না; আর যদি তার কথা স্মরণ করেও তবে তা করে মৃত্যুর উপর ক্ষোভ ও দুঃখপ্রকাশ করার জন্য! আর তার নিন্দাবাদে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অথচ মৃত্যুর এরকমের স্মরণ তাকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে আরও দূরত্বে ঠেলে দেয়; কেননা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

« من كره لقاء الله كره الله لقاءه» .

“যে ব্যক্তি আল্লাহ সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেন।” [৭৭]

[৭৭] বুখারী (১১/৩৬৪), হাদিস নং- ৬৫০৭; কোমলতা অধ্যায় (كتاب الرقاق), পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহও সেই ব্যক্তির

এতদসত্ত্বেও মৃত্যুকে স্মরণ করাটা তার জন্য কল্যাণকর; কারণ, মৃত্যুর স্মরণ তার নিয়ামতসমূহকে বিস্বাদ করে দেয় এবং তার নির্ভেজাল স্বাদকে অতিষ্ট করে দেয়। আর এমন বস্তু যা মানুষের স্বাদকে বিস্বাদে পরিণত করে এবং কামনা-বাসনাকে সংকুচিত করে, তা তার সৌভাগ্যের অন্যতম কারণ; আর এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أكثروا ذكر هادم اللذات الموت » .

"তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী মুত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ কর।"[৭৮] কারণ, মানুষ সার্বক্ষণিক দু'টি অবস্থার মধ্যে বিরাজমান থাকে; হয়

সাক্ষাতকে পছন্দ করেন (باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه); মুসলিম (৪/২০৬৫), হাদিস নং- ২৬৮৩, যিকির অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহও সেই ব্যক্তির সাক্ষাতকে পছন্দ করেন (باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه), হাদিসটি মারফু' সনদে কাতাদার সূত্রে আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি 'উবাদা রা. থেকে বর্ণনা করেন।

[৭৮] ইবনু হাব্বান (৪/২৮১, ২৮২), হাদিস নং- ২৯৮১, ২৯৮২, ২৯৮৩, ২৯৮৪; জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: মৃত্যুর স্মরণ প্রসঙ্গে (فصل في ذكر الموت); হাদিসটি আবূ সালমা সূত্রে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে মারফু' সনদে বর্ণিত। আর অপর এক বর্ণনার মধ্যে " الموت " শব্দটি অতিরিক্ত আছে। আর আলবানী 'সহীহ আল-জামে'' (صحيح الجامع) –এর মধ্যে (২৬৪৮) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, হাদিস নং- ১২১১ এবং তিনি তার সনদকে ইবনু ওহাব, ইবনু হাব্বান ও আল-বাযারের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

সে সঙ্কটময় ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যে থাকে, নতুবা প্রাচুর্য ও নিয়ামতের মধ্যে অবস্থান করে; সুতরাং সে যদি সঙ্কটময় ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যে থাকে, তাহলে মৃত্যুর কথা স্মরণ করা তার জন্য সহজ হয়, কেননা সে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেনা; আর যদি সে প্রাচুর্য ও নিয়ামতের মধ্যে অবস্থান করে, তাহলে তার নিকট মৃত্যু খুবই জটিল; সুতরাং মৃত্যুর স্মরণ তাকে প্রতারণা করা ও প্রাচুর্যের আরাম-আয়েশ থেকে বিরত রাখবে; যেমনটি হাদিসে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« كفى بالموت واعظا » .

“উপদেশ দাতা হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট”[৭৯]!!

আবু আলী আদ-দাক্কাক বলেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তি তিনটি জিনিস দ্বারা সম্মানিত হবে: দ্রুত তাওবা করা, মনের তৃপ্তি অনুভব করা এবং ইবাদতে প্রফুল্লতা অর্জিত হওয়া। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা ভুলে যাবে, তাকে তিনটি

---

[৭৯] আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু’র বক্তব্য থেকে ইবনু ‘আসাকীর এই বর্ণনাটি করেছেন; এটাকে হাদিসে মারফু‘ হিসেবে সহীহভাবে আমি অবগত নই। কেবলমাত্র তাবারানী অত্যন্ত দুর্বল সনদে তা মারফু বর্ণনা করেছেন। অবশ্য মাওকুফ বর্ণনায় তা ইবন মাসউদ, আম্মার ইবন ইয়াসের, আনাস প্রমুখ সাহাবী থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। [সম্পাদক]

জিনিস দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে: তাওবা করার ক্ষেত্রে গড়িমাসি করা, দুনিয়ার প্রতি লোভ এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে অবহেলা।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন: "হে আল্লাহর রাসূল! শহীদদের সাথে কোনো ব্যক্তির হাশর হবে কি? জবাবে তিনি বললেন: হ্যাঁ, যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বিশ বার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে।"[৮০]

আর এই মর্যাদা লাভের কারণ হল, মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়াকে অস্থায়ী আবাস বলে ভাবতে এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। আর তার (মৃত্যুর) ব্যাপারে অবহেলা তাকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও তার মজায় ডুবে থাকার দিকে এবং আখিরাতকে ভুলে থাকতে আহ্বান করে। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» . (أخرجه الترمذي و ابن ماجه) .

[৮০] এই বর্ণনাটি তাবারানী তার মু'জামুল আওসাত (৭৬৭৬) এর কাছাকাছি বর্ণনা।

“তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে বসবাস কর, মনে হবে তুমি যেন অপরিচিত অথবা মুসাফির।”[৮১] অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: নিশ্চয়ই তুমি মুসাফির, অচিরেই তুমি পরকালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে; সুতরাং দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরো না এবং তার প্রাচুর্য ও আসবাবপত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বে না। আর তোমার সুস্থতাকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ কর এবং তাকে আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্যের কাজে ব্যবহার কর; আর তুমি তোমার জীবনে এমন কিছু পেশ করার চেষ্টা কর, পুরস্কার দিবসের দিন যার দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল হবে; আর এটা হাসিল হবে শুধু মৃত্যুর কথা স্মরণ করার দ্বারা। সুতরাং এ জন্যই মৃত্যুর কথা স্মরণ করা সর্বোত্তম ও সবচেয়ে উপকারী কাজ বলে বিবেচিত। পক্ষান্তরে মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষের চিন্তাভাবনার কমতি ও তার কথা স্মরণ না করার করণে তার ব্যাপারে তারা উদাসীন থাকে; আর যে ব্যক্তি তার কথা স্মরণ করে, সে মুক্তমনে তার স্মরণ করে না, বরং দুনিয়ার বহু

---

[৮১] তিরমিযী (৪/৫৬৭), হাদিস নং- ২৩৩৩, অধ্যায়: দুনিয়ার মোহত্যাগ (كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم), পরিচ্ছেদ: আশা-আকাঙ্খা সীমিতকরণ প্রসঙ্গে যেসব বর্ণনা এসেছে (باب ما جاء في قصر الأمل); ইবনু মাজাহ (২/১৩৭৮), হাদিস নং- ৪১১৪, অধ্যায়: দুনিয়ার মোহত্যাগ (كتاب الزهد), পরিচ্ছেদ: দুনিয়ার উপমা প্রসঙ্গে (باب مثل الدنيا); আহমদ (২/২৪), হাদিসটি মুজাহিদের সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত। আর আলবানী ‘সহীহ আল-জামে‘’ (صحيح الجامع) –এর মধ্যে (২/৮৪০) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, হাদিস নং- ৪৫৭৯

ব্যস্ততার দ্বারা ব্যস্ততম হৃদয়ে তার কথা স্মরণ করে, ফলে এ স্মরণ তার হৃদয় মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। অথচ বান্দার উপর ওয়াজিব হল, সে তার অন্তরকে সবকিছু থেকে মুক্ত রাখলেও মৃত্যুর স্মরণ থেকে মুক্ত রাখবে না; কারণ মৃত্যু তার সামনে অপেক্ষমান। সুতরাং সে যখন মুক্তমনে তার কথা স্মরণ করবে, তখন নিশ্চিতভাবে তা তার মাঝে প্রভাব ফেলবে; আর এই সময় দুনিয়াতে তার হাসি ও আনন্দ কমে যাবে এবং তার অন্তর বিগলিত হবে। সুতরাং যার আত্মা বারবার অপরাধ করার প্রবণতার জালে আবদ্ধ হয়ে যায়, তার উপর আবশ্যক হল, তার আত্মাকে অন্তরের চিকিৎসা করার দ্বারা পরিশুদ্ধ করা; আর অন্তরের চিকিৎসা করাটা অত্যাবশ্যক। বিশেষ করে যখন অন্তর কঠোর হয়ে যায়, তখন তার চিকিৎসা করতে হয় চারটি জিনিস দ্বারা; আলেমগণ বলেছেন: যখন অন্তরসমূহ কঠোর ও নিষ্ঠুর হয়ে যাবে, তখন তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর আবশ্যক হবে চারটি জিনিসকে কর্তব্য বলে গ্রহণ করা:

প্রথমত: জ্ঞানের সেসব আসরসমূহে উপস্থিত হওয়া, যাতে মানুষকে বেশি বেশি দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে এবং অবাধ্যতা থেকে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা হয়; কারণ, এটা এমন জিনিস, যা অন্তরকে নরম ও কোমল করে এবং তার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত: মৃত্যুর কথা স্মরণ করা, যা সকল প্রকার স্বাদ ও মজা ধ্বংস করে, দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং ছেলে ও মেয়েদেরকে ইয়াতীম করে।

তৃতীয়ত: মরণাপন্ন ব্যক্তিদেরকে প্রত্যক্ষ করা; কারণ, মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করা এবং তার মৃত্যুযন্ত্রণা ও প্রাণ বের হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করা এবং তার মৃত্যুর পরে তার চেহারা নিয়ে চিন্তাভাবনা করাটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাদ-আহ্লাদকে হ্রাস করে, তাদের মন থেকে হাসি-আনন্দ দূর করে দেয়, চোখের পাতাকে ঘুমাতে বারণ করে, শরীরকে আরাম-আয়েশ উপলব্ধি করা থেকে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির চিকিৎসার সহযোগিতা নেওয়া উচিত, যার অন্তর কঠোর হয়ে গেছে এবং যার আত্মা বারবার অপরাধ করার প্রবণতার জালে আবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং সে যদি এর দ্বারা উপকৃত হয়, তাহলে এটাই যথেষ্ট; আর যদি তার অন্তরের ময়লা প্রকট হয় এবং অপরাধের উপায়-উপকরণগুলো দৃঢ়মূল হয়, তাহলে, [চতুর্থত:] এ ক্ষেত্রে কবর যিয়ারত এমন প্রভাব বিস্তার করবে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়টি যে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি; আর এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«زُورُوا الْقُبُورِ فَإِنَّها تذكر الموت والآخرة و تزهد في الدنيا » .

“তোমরা কবর যিয়ারত কর; কারণ, তা মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং তা দুনিয়ার মোহ ত্যাগে অনুপ্রাণিত করে।”[৮২] তন্মধ্যে প্রথমটি হলো কান দ্বারা শ্রবণ করা এবং দ্বিতীয়টি

---

[৮২] মুসলিম (২/৬৭১), হাদিস নং- ৯৭৬, জানাযা অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর প্রভু নিকট মায়ের কবর যিয়ারতের অনুমতি

হল নিশ্চিত গন্তব্যের ব্যাপারে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা; আর মরণাপন্ন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করা ও কবর যিয়ারত করার মধ্যে সরাসরি দেখা বা অবলোকন করার ব্যাপার রয়েছে; আর এ জন্যই এ দু’টি বিষয় প্রথম ও দ্বিতীয়টির চেয়ে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ; তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ليس الخبر كالمعاينة » .

“সংবাদ সরাসরি অবলোকন করার মত নয়।”[৮৩]

কিন্তু মরণাপন্ন ব্যক্তির অবস্থা প্রত্যক্ষ করার দ্বারা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। আর যে ব্যক্তি এক মুহূর্তের মধ্যে তার অন্তরের চিকিৎসা করতে চায়, তার জন্য তা

প্রার্থনা প্রসঙ্গে (باب اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ); হাদিসটি আবূ হাযেমের সূত্রে আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত।

[৮৩] আহমদ (১/২৭১), হাকেম (২/৩২১) এবং তিনি বলেছেন: হাদিসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তের আলোকে সহীহ, কিন্তু তাঁরা তাদের গ্রন্থদ্বয়ে তা বর্ণনা করেননি, আর ইমাম যাহাবী র.ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন; হাদিসটি সা‘ঈদ ইবন যোবায়েরের সূত্রে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মারফু‘ সনদে বর্ণিত। আর আলবানী ‘সহীহ আল-জামে‘’ (صحيح الجامع) –এর মধ্যে (২/৯৪৮) হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন, হাদিস নং- ৫৩৭৩ ও ৫৩৭৪, তিনি আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

যথাযথ হবে না। অবশ্য কবর যিয়ারতের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বাস্তবতা খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হয় এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিষয়টি খুবই ব্যাপক। কিন্তু যে ব্যক্তি কবর যিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করবে, তার জন্য উচিত হবে বিদ‘আত আশ্রিত যিয়ারত থেকে বেঁচে থাকা, যে পদ্ধতির যিয়ারত এ যামানার অধিকাংশ মানুষ করে থাকে। তা হল কিছু ব্যক্তিকে বরকতপূর্ণ মনে করে তাদের কবরের নিকট সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তা যিয়ারত করা; আর তাকে প্রদক্ষিণ করা, চুম্বন করা, স্পর্শ করা, কবরের মাটিতে গাল ঘষা, তার বালি গ্রহণ করা, কবরবাসীকে ডাকা, তাদের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা; তাদের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা, রিযিক, ক্ষমা, সন্তান, ঋণ পরিশোধ করা, দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা, চিন্তামুক্ত করা ইত্যাদি প্রয়োজন পূরণের জন্য সাহায্য চাওয়া, যা মূর্তিপূজারীগণ তাদের মূর্তিদের নিকট চেয়ে থাকে; অথচ এর কোনো কিছুই মুসলিম আলেমদের সর্বসম্মত মতে শরী‘য়ত সম্মত নয়। কেননা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা, তাবে‘য়ীন ও দীনের সকল ইমামগণের মধ্য থেকে কেউ এই ধরনের কাজ করেননি। বরং তার উচিত হবে, কবর যিয়ারতের আদবসমূহ যথাযথভাবে গ্রহণ করা; সেখানে আসার সময় মনোযোগ সহকারে আসা। তার সেখানে আসা যেন কবর প্রদক্ষিণের উদ্দেশ্যে না হয়, কারণ, তা হল এমন একটি অবস্থা, যার মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুও অংশগ্রহণ করে থাকে; বরং যিয়ারতকারীর জন্য তা যিয়ারতের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তা‘আলার

সন্তুষ্টি অর্জন করা, নিজেকে সংশোধন করা এবং তার অন্তরের রোগ নিরাময় করা।

আর কবরস্থানে প্রবেশের সময় কবরের উপর হাঁটা ও বসা থেকে বিরত থাকবে এবং তার জুতা জোড়া খুলে রাখবে, যেমনটি হাদিসের মধ্যে এসেছে, আর কবরবাসীদের উপর সালাম পেশ করবে, তাদেরকে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করার ন্যায় সম্বোধন করবে এবং বলবে:

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ »

(তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক; এটা মুমিনদের ঘর); কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ বলতেন।

আর যখন সে মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছবে, তখন তার জন্য উচিত হবে তার নিকট তার চেহারার দিক দিয়ে আগমন করা এবং তার প্রতিও সালাম পেশ করা, কিন্তু যখন সে দো‘আ করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন সে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দো‘আ করবে; আর অনুরূপ কথাই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারতের ব্যাপারে। তারপর যিয়ারতকারী ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে যে ব্যক্তি মাটির নীচে চলে গেছে এবং সঙ্গী-সাথী ও আপনজনদের সাথে প্রতিযোগিতা করার পর পরিবার-পরিজন ও প্রিয় ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; ধন-সম্পদ ও ধনভাণ্ডার সঞ্চয় করার পর তার নিকট মৃত্যু এসে হাজির হয়েছে

এমন এক সময়, যা সে কল্পনাও করতে পারেনি এবং এমন এক অবস্থায়, যা সে প্রত্যাশা করেনি; সুতরাং সে যখন কবরে প্রবেশ করেছে এবং প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে, তখন সে কি সঠিকভাবে জবাব দিতে পেরেছে এবং তার কবর কি জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য থেকে একটি বাগানে পরিণত হয়েছে? নাকি সে জবাব দানে ভুল করেছে? এবং তার কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি গর্তে পরিণত হয়েছে!!

অতঃপর সে নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করবে যে, সে যেন মারা গেছে, কবরে প্রবেশ করেছে এবং তার নিকট থেকে দূরে সরে গেছে তার সম্পদ, পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও তার পরিচিত লোকজন; আর সে একাই অবশিষ্ট রয়ে গেছে; এখন সে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে, সুতরাং সে কী জবাব দেবে? আর ঐ ব্যক্তিদের অবস্থা কী হয়েছে, তার ভাই ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্য থেকে যারা বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা করেছে, সম্পদের পাহাড় গড়েছে, কিভাবে তাদের আশা-আকঙ্খাগুলো কর্তিত হয়ে গেছে? আর তাদের সম্পদগুলো তাদের কোনো উপকারে আসেনি। আর মাটি তাদের চেহারাগুলোর সৌন্দর্যসমূহ বিবর্তন করে দিয়েছে, কবরের মধ্যে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তাদের পরে তাদের রমনীগণ বিধবা হয়ে গেছে, তাদের সন্তানগণ এতিম হয়ে গেছে এবং তাদের ভিন্ন অন্যরা তাদের সম্পদসমূহ বণ্টন করে নিয়ে গেছে। আর তার জেনে রাখা উচিত, দুনিয়ার প্রতি তার আকৃষ্ট হওয়া তো তাদের আকৃষ্ট হওয়ার মতই! আর তার অবহেলা সে তো তাদের অবহেলার মতই!

আর কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, সে তাদের গন্তব্যস্থলেই উপনীত হবে; আর সে যেন ভালো করে বুঝে নেয় যে, তার অবস্থাও তাদের অবস্থার মতই হবে, আর মৃত্যু হচ্ছে সর্বসম্পর্কের কর্তনকারী এবং ধ্বংস দ্রুত আগমনকারী।

* * *

হাদিসসমূহের সূচিপত্র

আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে হাদিসের অংশবিশেষ **পৃষ্ঠা**

৮. « اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعبد » (হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে মূর্তি বানিও না, যার পূজা করা হবে।) ....

৯.« أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ... » (অতঃপর, সর্বাধিক সত্য কথা হল আল্লাহর কিতাব ...).................................

১০. «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ...» (তোমাদের দুনিয়ার বিষয়ে তোমরাই ভাল জান ...) ....

১১. « إن الدعاء هو العبادة » (নিশ্চয়ই দো'য়া অন্যতম ইবাদত)

১২.« إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ... » (আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম ....

১৩. « إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ... »(আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম ....

১৪. « إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ... »(আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম ....).

১৫. « إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ... »(আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম ....)

১৬. « أيما امرأة خرجت إلى مقبرة ... » (যে কোন নারী সমাধিস্থলের উদ্দেশ্যে বের হয় ....) ....

১৭. « ... خَيْرُ القرون قَرْنِي » (আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ)

১৮. « ...زُورُوا الْقُبُور » (তোমরা কবর যিয়ারত কর ...)

১৯. « ... سَتَفْتَرِقُ أمتي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرقة » (অচিরেই আমার উম্মত তিহাত্তুর দলে বিভক্ত হয়ে যাবে ...).............

২০. « ... السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ » (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক; এটা মুমিনদের ঘর ...) ....

২১. « .... السلام عليكم يا أهل القبور ! » (হে কবরবাসী! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক ....) ....

২২. «... قُولِى السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ» (তুমি বল: কবরবাসী'র প্রতি সালাম ...) ....

২৩. ... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ » « (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তারা যখন সমাধিস্থলের দিকে বের হবে ...) .....

২৪. « ... كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ » (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফনকাজ সম্পন্ন করে অবসর হতেন ...) ....

২৫. « كفى بالموت واعظا » (উপদেশ দাতা হিসেবে মৃত্যুই যথেষ্ট)
....

২৬. « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور ...» (আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম, সুতরাং যে কবর যিয়ারত করতে চায় ...) ....

২৭. « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» (তুমি দুনিয়ার মধ্যে এমনভাবে বসবাস কর, মনে হবে তুমি যেন গরীব অথবা মুসাফির) ....

২৮. « لعنة الله على اليهود والنصارى ... » (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের উপর আল্লাহর লানত ...) ...

২৯. « لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم زوارات القبور » (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর যিয়ারতকারিনী নারীদের প্রতি লানত করেছেন) ....

৩০. « لو حسن أحدكم ظنَّه بحجر نفعه » (যদি পাথরের প্রতি তোমাদের কারও ধারণা ভাল হয়, তবে সেই পাথর তার উপকার করবে) ....

৩১. « ليس الخبر كالمعاينة » (সংবাদ সরাসরি অবলোকন করার মত নয়) ....

৩২. « ... من أين جئت » (তুমি কোথা থেকে এসেছ ...) ...

৩৩. «من كره لقاء الله كره الله لقاءه» (যে ব্যক্তি আল্লাহ সাক্ষাতকে অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেন) ....

৩৪.« ... من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا » (আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যে বেঁচে থাকবে, অচিরেই সে বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে ...) ....

৩৫. « لا تجتمع أمتي على الضلالة » (আমার উম্মত ভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না) ....

৩৬. « ... لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيدًا » (আমার কবরকে উৎসবের জায়গায় পরিণত করো না) ...

৩৭. « ... لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي » (আমার উম্মতের একটি দল ...)

* * *

সূচিপত্র

* * *